আমি পাকিস্তানী গুপ্তচর

আমি পাকিস্তানী গুপ্তচর

নটরাজন

ডি. এম. লাইব্রেরী / কলকাতা-৬

মা
শ্রীমতী কমলা দেবী
শ্রীচরণেষু

এই লেখকের অন্যান্য :

বিপ্লবেশ্বর
পুলিশ সাহেব
ওরা সেই পুলিশ (২য় সং)
থানার মাটি নোনা
লালবাজার
মেয়ে পুলিশের ডায়েরী
স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড (২য় সং)
রাফলিপি
প্রেম অভিসারে
প্রমীলা মহল
সম্রাট
রাজনাগিনী (২য় সং)
বাঁশরিয়া
পথভ্রষ্টা
পুষ্পগান্ধার
বলয়গ্রাস
বর্গী এলো দেশে (কিশোর উপন্যাস)
পুলিশেশ্বর (যন্ত্রস্থ)
ডানপিটে ভগবান (যন্ত্রস্থ)

॥ একটি কথা ॥

এটা কোন কল্পনাশ্রয়ী কাহিনী নয়।

লেখক—

১৯৫৫ সালে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে হানাদার পাঠিয়ে ভারতকে আক্রমণ করে বসলো পাকিস্তানের জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ। সেদিন বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে তিনি আস্ফালন করেছিলেন যে তিনি নাকি অচিরেই দিল্লীতে পাকিস্তানী পতাকা ওড়াবেন। কিন্তু বিধি বাম। দিল্লীতে পাকিস্তানী পতাকা ওড়ানো তো দূরের কথা, ভারতীয় জওয়ানদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে পিছু হঠতে হঠতে পাকিস্তানী সেনারা যখন লাহোর রক্ষার দুশ্চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত এবং ভারতীয় জওয়ানরা যখন ইসোগিল খাল পেরিয়ে লাহোরে প্রবেশের জন্যে প্রস্তুত তখনই বোধহয় চৈতন্যোদয় হলো আয়ুব খাঁর। দিল্লীতে পাকিস্তানী পতাকা ওড়াবার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে মান বাঁচাতে তিনি ছুটলেন তাসখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুরের সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছতে। সৌভাগ্য পাকিস্তানের যে আয়ুব কোনক্রমে তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে বাঁচাতে সমর্থ হলেন পাকিস্তানের মান, আর দুর্ভাগ্য ভারতের যে, তাসখন্দ থেকে দিল্লীতে নিয়ে আসতে হলো লালবাহাদুরের মৃতদেহ।

কিল খেয়ে কিল হজম করতে হলো আয়ুবকে। ভারতের হাতে মার খেয়ে পাকিস্তান তখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। কি নিদারুণ লজ্জা! এই লজ্জা থেকে যে পরিত্রাণ পেতেই হবে পাকিস্তানকে। কাজেই ছেড়ে দাও গুপ্তচর বাহিনী। ওরা ভারতীয় বাহিনীর খবরাখবর জোগাড় করে নিয়ে আসুক। সেই খবরের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তান আবার তৈরি করবে নিজেকে। আবার একদিন আক্রমণ করবে ভারত।

পাকিস্তান তার গুপ্তচর বাহিনীর জাল কেবল পশ্চিমেই ছড়িয়ে দিলে না, পূবে অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তান অঞ্চলেও রাতারাতি সক্রিয় হয়ে উঠলো গুপ্তচর বাহিনী। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে ঢুকে ভারতীয় বাহিনীর ঘাঁটিগুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে উঠে পড়ে লাগলো তারা। এই কাজে তাদের

প্রধান সহায় এদেশেরই একদল নাগরিক যারা সেদিন কিছু অর্থের বিনিময়ে পঞ্চম বাহিনীর কাজ করে মাতৃভূমির স্বার্থ বিলিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করেনি। সেই গুপ্তচর চক্র নিয়েই এই কাহিনীর বিস্তার।

১৯৫৭ সালের জুলাই মাস। পূর্ব পাকিস্তানের বুড়িমারি সীমান্তের এক রেল স্টেশন। বাইরে ঝমঝমে বৃষ্টি, আর স্টেশনের ওয়েটিংরুমে একদল যাত্রী পরের দিন সকালের গাড়ি ধরবার জন্যে অপেক্ষারত। টিমটিমে আলো জ্বলছে ওয়েটিংরুমে। মেঝেয় বিছানা পেতে যাত্রীরা প্রায় সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। গভীর রাত। বিছানা পাতার জায়গা না পেয়ে কেউ কেউ দেয়ালের পাশে কোনরকমে একটু জায়গা করে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছে। সারারাত এমনি ভাবেই কাটাতে হবে তাদের।

মাঝারি সাইজের একটা এ্যাটাচি কেসের ওপর বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছিল একটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক। পরনে তার টেরিলিনের পোশাক। তার পা দুখানা মাঝে মাঝেই প্রসারিত হয়ে সামনের ঘুমন্ত লোকটির গায়ে গিয়ে লাগছিল। এই লোকটিও যুবক, কিন্তু বয়স এর কিছু বেশি।

এক সময় প্রথম যুবকটির একখানা পা এসে দ্বিতীয় যুবকটির গায়ে লাগতেই দ্বিতীয়ের ঘুম ভেঙে যায়। বিরক্ত ভঙ্গিতে পাশ ফিরে শুতে শুতে একবার প্রথম যুবকটির দিকে তাকায় সে। তারপর একটা হাই তুলে কি মনে করে বিছানার ওপর উঠে বসে। বালিশের নীচে হাত ঢুকিয়ে সিগারেট দেশলাই বের করে একটা সিগারেট ধরায়।

দ্বিতীয় যুবকটির নড়াচড়া ও দেশলাইয়ের আলোয় প্রথম যুবকটির ঝিমুনিও বন্ধ হয়। সোজা হয়ে বসে সে তাকায় দ্বিতীয়ের দিকে। দ্বিতীয়ের সিগারেটের ওপর চোখ পড়তেই তার নিজেরও নেশার উদ্রেক হয়। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগিয়ে এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে দেশলাই না পেয়ে একমুহূর্ত ইতঃস্তত করে। তারপর দ্বিতীয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, দেশলাইটা একবার দেবেন ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। এই তো নিন না।

সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা মালিককে ফেরত দিয়ে আলাপের সূত্র খোঁজে প্রথম যুবক।

—মনে তো হচ্ছে সারা রাত ধরেই বৃষ্টি হবে।

—হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

—কোথায় যাবেন ?

দ্বিতীয় যুবকটি গন্তব্যস্থলের নাম বলতেই প্রথম যুবকটি আবার বলে ওঠে, তাই নাকি ? আমিও তো ওখানেই যাবো।

প্রথম যুবকের আবার প্রশ্ন, ওখানেই থাকেন বুঝি ?

—না না, আমি থাকি পার্বতীপুর।

—পার্বতীপুরের কোথায় ?

—চেনেন নাকি পার্বতীপুর ?

—বারে, আমিও যে ওখানকারই লোক।

—তাই নাকি ? আমাদের বাড়ি পেট্রোল ট্যাংকের গায়ে।

একটু থেমে প্রথম যুবকটি আবার জিজ্ঞেস করে, নাম কি আপনার ?

দ্বিতীয় যুবক একটু সময় দ্বিধা করে। তারপর জবাব দেয়, আব্দুল করিম। আপনার ?

—নূর ইসলাম।

নূরের কথা বলার ধরনে আব্দুলের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে নূর তেমন একটা শিক্ষিত নয়। তাই সে আবার জিজ্ঞেস করে, পার্বতীপুরে ব্যবসা-ট্যাবসা করেন বুঝি ?

এবার আর সরাসরি জবাব না দিয়ে নূর বললে, হ্যাঁ, ঐ রকমই। আপনি ?

—আমি মিলিটারীতে কাজ করি। জবাব দেয় আব্দুল।

—ঢাকায় ?

—হ্যাঁ, কখনও ঢাকায়, কখনও যশোরে, কখনও বা দিনাজপুরে। আমাদের কাজের জায়গার কি কিছু ঠিক আছে ?

—তা যা বলেছেন, বলতে থাকে নূর, মিলিটারীর চাকরি। সোজা কথা তো নয়। তার ওপর রয়েছে খোদ আয়ুব খাঁ, কি বলেন ?

—হ্যাঁ। কথাটা বলেই আব্দুল সিগারেটে একটা জোরে টান

দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে।

আব্দুলের মিলিটারী চাকরির কথা শুনে নূর তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে বললে, শক্ত লোক বটে আয়ুব খাঁ। আল্লাহতালার ইচ্ছায় বেঁচেবর্তে থাকলে উনি দেশের অনেক উপকার করবেন বলেই মনে হয়।

একজন লোকের মুখে এধরনের কথায় আব্দুলের মত সেনা-বাহিনীর একজন কর্মীর উৎসাহিত হওয়ারই কথা। কিন্তু আব্দুল কেবল বুদ্ধিমানই নয় সতর্কও বটে। কার মনে কি আছে বলা যায় না। তাই সে মুখে জবাব না দিয়ে কেবল মাথা নেড়ে একটু হাসে।

নূর আবার বললে, মিলিটারীতে যখন কাজ করেন তখন আমাদের জামিল সাহেবকে নিশ্চয়ই চেনেন?

ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে আব্দুল, জামিল সাহেব? ক্যাপ্টেন জামিলের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ ক্যাপ্টেন জামিল। বড়ই ভালো লোক।

—আপনি তাকে চেনেন নাকি?

একটু হেসে নূর জবাব দেয়, চিনি মানে? খুব ভালো ভাবেই চিনি।

—কেমন করে চিনলেন? প্রশ্নটা করেই আব্দুল তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে নূরের দিকে।

জবাব দিতে গিয়ে একটু থতমত খেয়ে যায় নূর। কি জবাব দেবে সে? তার মত একটি সামান্য লোকের সঙ্গে ক্যাপ্টেন জামিলের পরিচয়ের কথা বলতে গেলে তো অনেক কথাই বলতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেসব কথা বলে দেয়া উচিত কিনা বুঝতে না পেরে সে চুপ করে থাকে।

এতক্ষণে আব্দুল যেন নূরের আসল পরিচয় জানতে পারে। নূর নিজের পুরো পরিচয় না দিলেও ক্যাপ্টেন জামিলের সঙ্গে তার পরিচয়ের ব্যাপারটাই নূরের পুরো পরিচয় পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। দিনাজপুরের গুপ্তচর বাহিনীর কর্তা ক্যাপ্টেন জামিলকে আব্দুল বেশ ভালোভাবেই চেনে। সে নিজে পূর্ব-পাকিস্তানের ২০০ সার্ভে সেকশনের লেফটেনান্ট। কাজেই কেবল ক্যাপ্টেন জামিল নয়, তার কাজ কর্ম সম্পর্কেও সে ওয়াকিবহাল।

নূরের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ে আব্দুল। জিজ্ঞেস করে, আপনি বুঝি টেরিলিন কাপড় চোপড়ের ব্যবসা করেন?

—কেমন করে বুঝলেন? বিস্মিত কণ্ঠস্বর নূরের।

সে কথার জবাব না দিয়ে আব্দুল আবার বললে, বোধহয় বর্ডারের ওপারে ব্যবসা করেন?

নূরের মুখে আর কথা সরে না। লোকটি সর্বজ্ঞ নাকি? কেমন অবলীলায় সঠিক কথাগুলো গড় গড় করে বলে যাচ্ছে।

নূরের মুখের অবস্থা দেখে একটু হাসে আব্দুল। তারপর ধীরে ধীরে বলতে থাকে, এতে অবাক হওয়ার কি আছে? আপনার ঐ এ্যাটাচি কেসটা দেখেই আমার মনে হয়েছে ওতে বোধহয় টেরিলিনের কাপড় চোপড় আছে। আর ক্যাপ্টেন জামিলের সঙ্গে আপনার পরিচয়ের কথা শুনে বুঝতে পারছি আপনি তারই লোক। তার মানে, টেরিলিনের কাপড় চোপড়ের ব্যবসার আড়ালে বর্ডারের ওপারে আপনি অন্যকাজ করে বেড়ান।

হাতের আধপোড়া সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূর বললে, আপনি ঠিকই ধরেছেন।

কথাটা শেষ করেই হঠাৎ থেমে যায় নূর। এই অপরিচিত লোকটির কাছে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ায় বিপদের ঝুঁকি আছে কিনা তাই বোধহয় মনে মনে চিন্তা করতে থাকে।

নূরের মনের কথা যেন টের পায় আব্দুল। মনে মনে একটু হেসে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে একটা হাই তোলে। তারপর বিছানায় আবার শুতে গিয়ে হঠাৎ কি মনে করে নূরের দিকে তাকায়। অবশেষে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, সারারাত এমনি ভাবে বসে কাটাবেন নাকি?

জবাবে নূর বললে, তাছাড়া আর উপায় কি বলুন? দু'রাত ঘুমাইনি। আজকের রাতটাও জেগে কাটাতে হবে দেখছি।

—আপনার বিছানাপত্র কোথায়?

জবাব দেয় নূর, এই এ্যাটাচি কেসটা ছাড়া সঙ্গে আর কিছু নেই। লটবহর নিয়ে যাতায়াত করা কি আমাদের চলে?

—যা বলেছেন, বলে ওঠে আব্দুল। তারপর একটু সময় চিন্তা করে আবার বললে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে

তাহলে আমার এই বিছানাতেই একটু কাত হতে পারেন। শত হলেও একই লাইনের লোক তো?

—আপনিও বুঝি ক্যাপ্টেন জামিল সাহেবের—

—আমি সার্ভে সেকশনের লেফটেনাণ্ট।

পাশাপাশি শুয়ে আব্দুল করিম ও নুর ইসলাম। বাইরে একটানা বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ঝম্ ঝম্ শব্দে একটা মালগাড়ি চলে গেল স্টেশন কাঁপিয়ে। বলে ওঠে নূর, ঘুমুলেন নাকি, ভাইজান?

—না, ঘুম আসছে না। জবাব দেয় আব্দুল।

—জানেন ভাইজান, টেরিলিন কাপড় স্মাগলিংয়ের ছদ্মবেশে বর্ডার পারাপার করি। আজ এখানে কাল ওখানে, এমনি ভাবে ঘুরে ঘুরে খবর জোগাড় করে কর্তাদের কানে পৌঁছে দিই। বিনিময়ে পয়সা কড়ি যা পাই তাতেই কোন মতে চলে যায়। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এসব আর ভালো লাগে না।

জিজ্ঞেস করে আব্দুল, এ কাজ আপনার ভালো লাগে না?

জবাব দেয় নূর, ভালো না লাগলেও উপায় কি? পেট চালাতে হবে তো?

—তাহলে কি আপনি কেবল পেটের দায়েই এই কাজে নেমেছেন?

—পেটের দায়ে তো বটেই। তাছাড়া—

—তাছাড়া কি?

একটু সময় চুপ করে থাকে নূর। তারপর আবার তেমনি মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, সত্যি বলতে কি ভাইজান, এতকাল বুঝিনি কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কায়েদে আজমের চেষ্টায় পাকিস্তান পয়দা হয়েছে বটে, তবে একে টিকিয়ে রাখতে হলে ঐ হিন্দুস্থানের মিলিটারীর খবরাখবর জোগাড় করে এনে দিতে হবে। তাই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও একাজে লেগে আছি।

—হ্যাঁ, বিপদের ঝুঁকি যথেষ্টই রয়েছে এই কাজে, বলতে থাকে আব্দুল, তবে ঘুরে ঘুরে খবর জোগাড় করার চাইতে কোথাও স্থির হয়ে বসে একাজ করায় ঝঞ্ঝাট অনেক কম।

—যা বলেছেন, ভাইজান। কিন্তু—

নূর হঠাৎ থেমে যেতেই আব্দুল আবার জিজ্ঞেস করে, ওকি,

থামলেন কেন হঠাৎ ?

নূর কোন জবাব না দিয়ে আব্দুলের গায়ে ছোট্ট একটা চিমটি কাটতেই আব্দুল পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখে ওদের পাশের বিছানার মাঝ বয়সী লোকটি মিটমিট করে তাকাচ্ছে তাদের দিকে। লোকটির পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, মাথায় কাঁচাপাকা চুল।

নূর ইসলামের মত অল্প শিক্ষিত কিম্বা প্রায় অশিক্ষিত একটি যুবক নিজেকে যতই কেন না পূর্ব পাকিস্তানের গুপ্তচর বাহিনীর একজন কর্মী বলে মনে করুক, আসলে সে তা মোটেই নয়। গুপ্তচরবৃত্তি এত সহজ নয়। এর জন্যে বিদ্যা ও বুদ্ধির সঙ্গে বিশেষ ধরনের ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন। নূর ইসলামের সেসব কিছুই নেই। স্মাগলারের ছদ্মবেশে বর্ডারের ওপারে ভারতীয় সৈন্য ছাউনীর সাধারণ কিছু খবরাখবর এনে দেওয়াই তার কাজ। কর্তৃপক্ষও তার কাছ থেকে এর বেশি কিছু আশা করে না। কিন্তু আব্দুল করিম তা নয়। সে একজন মিলিটারী অফিসার। এসব কাজের অভিজ্ঞতাও তার আছে। পাশের বিছানার লোকটির দিকে একটু সময় তাকিয়েই সে বুঝতে পারে কান খাড়া করে তাদের আলোচনা শোনার মত আগ্রহী সে নয়। তাহলে চোখ মেলে তাদের দিকে না তাকিয়ে চোখ বুজে ঘাপটি মেরে শুয়েই সে সবকিছু শুনতে চেষ্টা করতো। আসলে কোন কারণে লোকটির ঘুম ভেঙে যেতেই সে চোখ মেলে তাদের দিকে তাকিয়েছিল।

পাশ ফিরে নূরের মুখোমুখি শুয়ে কণ্ঠস্বর আরও এক পর্দা নীচে নামিয়ে আব্দুল বললে, না—না, ও কিছু নয়। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, নির্ঝঞ্ঝাটে যদি খবর জোগাড় করতে চান তাহলে কোথাও গিয়ে খুঁটি হয়ে বসতে হবে। কর্তাদের বলুন তেমন একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে।

খানিকক্ষণ নিজের মনে কি যেন চিন্তা করে নুর। তারপর জিজ্ঞেস করে, কোথায় গেলে ভালো খবর জোগাড় করা যাবে, ভাইজান।

জবাবে আব্দুল বললে, দেখুন কাছাকাছির মধ্যে তেমন জায়গা হচ্ছে শিলিগুড়ি। ভারতীয় সৈন্যের মস্তবড় ঘাঁটি ওখানে।

চেষ্টা করলে ওখানেই এমন সব দামী খবর পেতে পারবেন যা নাকি পাচার করতে পারলে আমাদের কর্তারা লুফে নেবে। মোটা রোজগার করতে পারবেন আপনি।

আব্দুল করিমের কথায় লোভের আগুন দেখা দেয় নূরের চোখে। ছেলেবেলা থেকেই দারিদ্র্যের মধ্যে সে মানুষ। এতটা বয়স পর্যন্ত কম দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয় নি তাকে। কেবল মাত্র বেঁচে থাকার জন্যে ছেলেবেলাতেই পথে নামতে হয়েছিল।

শৈশবের কথা মনে পড়লে এখনও কেমন যেন অবাক লাগে নূরের। সে আজ পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দা। গুপ্তচর বৃত্তি নিয়ে শিলিগুড়িতে যাবার জন্যে সে আজ উদগ্রীব। কিন্তু শিলিগুড়ি তো তার কাছে অপরিচিত নয়। জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিলিগুড়ির আলোতেই সে প্রথম চোখ মেলে তাকিয়েছিল। ঐ শিলিগুড়ির বাতাসেই সে জীবনের সর্বপ্রথম নিঃশ্বাস নিয়েছিল। অনেককাল আগে সিনেমায় দেখা ছবির মত আজও ঐ শিলিগুড়ির অস্পষ্ট ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

শুধু কি তাই? নূর ইসলাম আজ পূর্ব পাকিস্তানের একজন মুসলমান যুবক। আল্লাহ্‌তালার ইচ্ছে থাকলে আজ সে ঐ শিলিগুড়ির-ই একজন হিন্দু যুবক হতে পারতো। এযুগের সমাজ-ব্যবস্থা পিতৃ-শাসিত বলেই সে আজ মুসলমান, মাতৃ-শাসিত হলে সে আজ হতো হিন্দু।

॥ দুই ॥

যৌবনে পা দিয়েই সুরবালা বুঝতে পারলো যে তার নিজের বয়সী কোন কুমারী মেয়ের চাইতেই সে খাটো নয়। তাদের মতই তার চোখের দৃষ্টিতেও বিদ্যুৎ চমক, তাদের মতই তারও দেহের ভাঁজে ভাঁজে জমতে শুরু করেছে গভীর রহস্য। চোখের এই বিদ্যুৎ চমক ও দেহের এই রহস্যের আকর্ষণে পুরুষের মাথা

ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতা তারও আছে।

কিন্তু কেবল ক্ষমতা থাকলেই তো হবে না, তা প্রয়োগের সুযোগ কোথায়? যেখানে কুমারী মেয়েরা তাদের এই ক্ষমতা সযত্নে রক্ষা করে চলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গীদের ওপর প্রয়োগ করার জন্যে সেখানে সুরবালার তো তেমন সুযোগ নেই। সে যে বাল-বিধবা। তার জীবনে কোন পুরুষ তো তার এই বৈধব্য ঘুচিয়ে তাকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করতে এগিয়ে এলো না। হয়তো তার মনের কোণে একটু আশা ছিল যে কেউ আসবে। বাল-বিধবার কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে একটি সুস্থ সবল পুরুষ তাকে বুকে তুলে নেবে। কিন্তু বৃথাই সুরবালার প্রতীক্ষা। কেউ এলো না।

না, ঠিক তা নয়। কেউ এলো না বললে ভুল হবে। বরঞ্চ বলা যেতে পারে অনেকেই এলো। মধুলোভী মৌমাছির মত অনেকেই এসে ঘুর ঘুর করতে লাগল সুরবালার চারিপাশে। তারা প্রত্যেকেই উদগ্রীব সুরবালাকে বুকে তুলে নিতে। কিন্তু সিঁদুরের টিপ পরাতে রাজী নয় কেউ।

দিন গড়িয়ে যেতে থাকে। প্রকৃতি কাজ করে যেতে থাকে আপন নিয়মে। সুরবালার দেহ মনে জোয়ারের ঢেউ। বিশ্বাস করে এগিয়ে যেতে গিয়ে ভয় পেয়ে সে পিছিয়ে আসে। পুরুষের চোখের ঐ কামনার আগুনকে সে বিশ্বাস করবে কেমন করে? তার জীবনের ওপর দিয়ে কেটে যেতে থাকে একটির পর একটি বসন্ত। কঠিন সংযমে নিজেকে সরিয়ে রাখে সুরবালা। লোভের হাতছানিকে অগ্রাহ্য করে চলে। অবশেষে একদিন পরাজয় ঘটলো তার।

না, পরাজয় নয়। শঠতার শিকার হতে হল তাকে। বিশ্বাস করে ঠকতে হলো। সুরবালার দেহ-মন বিধ্বস্ত করে দিয়ে একদিন সে সরে পড়লো। হতভাগিনী বাল্য-বিধবা সুরবালার কপালে আর সিঁদুর উঠল না।

রাগে, দুঃখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সুরবালা। তার নারীত্বের এমন অপমান সে সহ্য করবে কেমন করে? কিন্তু উপায় নেই, সহ্য করতেই হবে। হিন্দু বাল-বিধবার এটাই যে বিধিলিপি।

সুরবালা মূর্খ। তাই ঘর বাঁধার তাড়নায় আবার সে আর

একজনকে বিশ্বাস করে বসলো। আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। যথেচ্ছ লুণ্ঠনের পরে প্রত্যাখ্যান।

অবশেষে সুরবালার জীবনে এল তারই প্রতিবেশী আর একজন পুরুষ। ধর্মে সে মুসলমান, নাম তার জামির মিঞা। বয়সের ব্যবধান যদিও কিছু বেশি, কিন্তু সেই ব্যবধানকে সুরবালা আমল দিলে না মোটেই। ঘর বাঁধার আকাঙ্ক্ষায় জামিরের ধর্মকেও সে পরোয়া করলে না। একটি সুস্থ সবল পুরুষের কাছে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা পেতেই হবে, এমনকি সেই পুরুষ বিজাতীয় হলেও।

সুরবালার সঙ্গে জামির মিঞা কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। মুসলমানী প্রথায় তাদের বিয়ে হলেও হিন্দু সুরবালা মনে-প্রাণে হিন্দুই রইলো। অবশেষে তার পেটে এল জামিরের সন্তান। ১৯৪৫ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ হবার মুখে। সুরবালার কোলে এল একটি পুত্রসন্তান। শিলিগুড়ির আলোয় চোখ মেললো সে, শিলিগুড়ির বাতাসে সে প্রথম নিঃশ্বাস নিল। জামির মিঞা ছেলের নাম রাখলে বেঙ্গু।

শিলিগুড়ি শহরের খালপাড়ায় ভাড়া বাড়ির একখানি মাত্র ঘরে হিন্দু স্ত্রী নিয়ে জামির মিঞার ছোট্ট সংসার। এখানেই ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল বেঙ্গু। সুরবালা কিন্তু হিন্দু নাম রাখলে ছেলের। ডাকতো তাকে মণ্টু বলে।

অবশেষে এল সেই ১৯৪৭ সাল। সৃষ্টি হল নতুন রাষ্ট্র, মহম্মদ আলী জিন্নার সাধের পাকিস্তান। দ্বিখণ্ডিত বাংলার ওপার থেকে সাম্প্রদায়িকতার বলি লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু আসতে শুরু করলো এপার বাংলায়। সামান্য কিছু মুসলমান উদ্বাস্তুও চলে গেল ওপারে। জামির মিঞা কিন্তু অটল। শিলি-গুড়ি ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না। গ্রামাঞ্চলে তার কিছু জমিজমা ছিল, আর সহরে ছিল সামান্য ব্যবসা। তাই দেখা-শোনা করে তার চলতে লাগলো।

১৯৫০ সাল। নোয়াখালীর হিন্দু নিধনের ঢেউ এসে লাগলো পূর্ব ভারতে। শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ভয় পেল জামির মিঞা। আর বুঝি এখানে থাকা চলে না। কিন্তু ওপারে গিয়েও বা কি করবে? জমি-জমা পড়ে থাকবে এপারে, আর

ওপারে খালি হাতে সে যাবে কিসের আশায় ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলে যাওয়াই সাব্যস্ত করলে জামির মিঞা। জমিজমা বদল করে সপরিবারে সে চলে গেল ওপারে। দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে সে গড়ে তুলল নতুন বসত।

হিন্দু মা পেটে ধরলেও মুসলমানের ছেলে মুসলমানই হয়। পার্বতীপুরেই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুসলমানী হলো বেঙ্গু। এবার তার নাম হলো নুর ইসলাম। বাপ মা দুজনেই তাকে ডাকতো নুরু বলে। হয়তো নুরুর মধ্যেই সুরবালা নারু অর্থাৎ নারায়ণের সন্ধান পেয়েছিল।

মোটামুটি ভালই চলছিল জামিরের সংসার। কিন্তু অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর—এই আপ্তবাক্যটির মত সাংসারিক সুখ বেশিদিন সহ্য হলো না সুরবালার। দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করতে গিয়ে ইহলোক ত্যাগ করতে হলো তাকে।

সুরবালাকে বাস্তবিকই ভালোবাসতো জামির। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে একাই মানুষ করতে লাগলো নুরুকে। তিনটি বছর এমনি চলার পরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে। অবশেষে আবার বিয়ে করতে হলো তাকে। এবারে এলো তার মুসলমান স্ত্রী।

একে সতীন পুত্র, তায় সেই সতীন আবার হিন্দু। কাজেই সেই মুসলমান স্ত্রীলোকটির বিষ নজরে পড়লো নূর। ঘরে টিঁকতে পারে না, তাই বাইরে বাইরেই কাটতে লাগল তার সময়। বাড়ি ঢুকলেই সেই বিমাতার গঞ্জনা—হিন্দু মায়ের পেটে যখন জন্মেছে তখন ও কেমন করে সাচ্চা মুসলমান হবে ?

সংসারে নূরের একমাত্র আশ্রয়স্থল তার বাবা জামির। কিন্তু সেও বা কতক্ষণ বাড়ি থাকে ? তাই লেখাপড়া হল না নূরের। স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যে অধিগত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নূরের বিমাতা ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলো। বললে —এই দুর্দিনের বাজারে কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা খরচ করে ছেলেকে বিদ্বান বানিয়ে লাভ কি ? তার চাইতে ঘরের কাজ-কর্ম করুক। জামির মিঞা তখন তার দ্বিতীয় পক্ষের হাতের পুতুল। কাজেই নূরের স্কুলের বিদ্যে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্তই। ইচ্ছে থাকলেও আর একটুও এগোতে পারলে না সে।

এমনিভাবেই ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে নূর। কৈশোর

ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিতেই সে বুঝতে পারে এমনি ভাবে আড্ডা দিয়ে, গল্প করে বেশিদিন তার চলবে না। একটা কিছু কাজ-কর্ম তাকে করতেই হবে। কিন্তু কি কাজ করবে সে? এযুগে যেখানে শিক্ষিত ছেলেরাই বেকার হয়ে ঘুরে বেড়ায় সেখানে তার মত ক্লাশ টু-এর বিদ্যে পেটে নিয়ে কি কাজ করবে সে?

তবুও কিন্তু কাজ জুটে গেল নূরের দিনাজপুরের একটি শালকরের দোকানে। ছেঁড়া জামা-কাপড় রিপু করার কাজ জানে না নূর। তাই, তার কাজ হলো জামা-কাপড় কাচা ও রং করা। এ কাজে পরিশ্রম যথেষ্ট। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বিশ্রামহীন কাজ। জল ঘেঁটে আঙুলে হাজা হয়ে যায়। কিন্তু সেই তুলনায় মাইনেপত্র অতি নগণ্য। তার ওপর যখন তখন মালিকের চোখ রাঙানি।

এই কাজের ওপর প্রচণ্ড এক বিতৃষ্ণা জন্মেছিল নূরের। কিন্তু উপায় নেই, পেট চালাতে হবে তো। তাই ইচ্ছে থাক-লেও পারছিল না কাজ ছাড়তে। অবশেষে একদিন কিন্তু কাজই ছাড়লো তাকে। মস্ত চুরি হল দোকানে। তালা ভেঙে চোর ঘরে ঢুকে দোকানের যাবতীয় জামা-কাপড় নিয়ে সরে পড়লো। মালিকের মাথায় হাত। খদ্দেরের ঝামেলা এড়াতে সেই যে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হলো আর খুললো না। সেই সঙ্গে আবার বেকার হল নূর।

নূর শালকরের দোকানের কাজ ছাড়তে চাইলেও কমলি কিন্তু ছাড়ল না তাকে। আবার চাকরি জুটলো তার। এটাও শালকরের দোকান। ঐ দিনাজপুরেই।

মনের মধ্যে প্রচণ্ড অশান্তি নিয়ে বরাদ্দ কাজ করে চলে নূর। আর সেই সঙ্গে এই কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ জুটিয়ে নিতে মনে মনে ছটফট করতে থাকে। কিন্তু কাজ কোথায়? পেটে স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যে নিয়ে কোন্ কাজ তার জুটবে? হাতে যদি কিছু টাকা থাকতো তাহলেও না হয় কোন একটা ব্যবসায় নেমে পড়তো। ব্যবসার দিকে তার বরাবরের ঝোঁক। কিন্তু তাও হবার নয়। ব্যবসায়ের মূলধন যোগাবে কে?

এমনি যখন নূরের মনের অবস্থা ঠিক তখনই একদিন তার দেখা হল রজব আলীর সঙ্গে। রজবও পার্বতীপুরের ছেলে।

বয়সে নূরের চাইতে কিছু বড়। ছেলেবেলা থেকেই পরিচয়।

রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে রজব আলীকে দেখে নূরই ডাকে তাকে। বলে, এই যে বড়ভাই, কবে এলে এখানে?

—আরে নূর যে। তা তুই কোথায় আছিস? কি করছিস?

রজব আলীর পোশাক পরিচ্ছদের দিকে তাকিয়ে নূর বুঝতে পারে যে সে বেশ ভাল রোজগার করছে। তাই সে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে জবাব দেয়, এখানেই তো আছি অনেকদিন।

—তাই নাকি? হাতের সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে সেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রজব আলী আবার জিজ্ঞেস করে, কি করছিস?

—শালকরের দোকানে কাজ করছি। তা, তুমি এখানে কেন, বড়ভাই?

ভারিক্কি চালে জবাব দেয় রজব আলী, ব্যবসা করি। কখন কোথায় থাকি তার কি কিছু ঠিক আছে?

—কিসের ব্যবসা?

—এই, কাপড় চোপড়ের।

কথা বলতে বলতে নূর ও রজব আলী এসে ঢোকে একটা চা দোকানে। অনেকদিন পরে দেখা। ফুরোতে চায় না তাদের কথা।

এক সময় নূর বললে, আমাকে তোমার ব্যবসায় ঢুকিয়ে নাও না, বড়ভাই।

—আমার ব্যবসায়? হেসে উঠে বলতে থাকে রজব আলী, আমি যে ব্যবসা করি তা একা একাই করতে হয়। দু'জনে মিলে সম্ভব নয়।

—সে আবার কেমন ব্যবসা? বিস্মিত কণ্ঠস্বর নূরের।

রজব আলী নূরের বিস্ময়কে আমল না দিয়ে জিজ্ঞেস করে, সত্যিই কি তুই ব্যবসা করতে চাস?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় নূর, হ্যাঁ বড়ভাই আল্লার কসম, ব্যবসা করার সুযোগ পেলে এই মুহূর্তে চাকরি ছেড়ে দেব। বিশ্বাস করো, এই চাকরি আর ভাল লাগছে না।

একটু সময় চিন্তা করে রজব আলী। তারপর নিজের ঠিকানা দিয়ে নূরকে বললে, কাল সন্ধ্যায় আমার ওখানে একবার আয়।

দেখি কি করতে পারি।

পরের দিন সন্ধ্যায় নূর রজব আলীর সঙ্গে দেখা করতেই রজব আলী সোৎসাহে বলে ওঠে, ব্যবস্থা সব করে ফেলেছি। এবার চল্‌ তার সঙ্গে দেখা করে আসি।

—কার সঙ্গে, বড়ভাই? কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে নূর।

জবাব দেয় রজব আলী, মস্তবড় খানদানী মানুষ। চল্‌, দেখলেই বুঝতে পারবি। কোন চিন্তা নেই। তোর ব্যবসার সবকিছুই তিনি করে দেবেন।

—কিন্তু—। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠস্বর নূরের।

—কিন্তু কি রে?

—আমার তো পয়সা কড়ি নেই। কেমন করে ব্যবসা করবো?

হেসে উঠে জবাব দেয় রজব আলী, পয়সা কড়ি নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না। তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

দিনাজপুরের পাকিস্তানী গুপ্তচর বাহিনীর কর্তা ক্যাপটেন জামিল। বাড়িতেই ছিল সে। খবর পেয়ে তার নিজের ঘরে ডেকে পাঠালে রজব আলী ও নূরকে।

তারা এসে সামনে দাঁড়াতেই ক্যাপ্টেন জামিল তীক্ষ্ণ চোখে একটু সময় তাকিয়ে থাকে নূরের দিকে। তারপর রজব আলীকে জিজ্ঞেস করে, এটিই বুঝি তোমার সেই বন্ধু?

—হ্যাঁ জনাব, মাথা নেড়ে সায় দেয় রজব আলী।

—এ কাজ করতে পারবে?

—পারবে বলেই তো মনে করি, জনাব।

ক্যাপটেন জামিল এবার নূরকেই জিজ্ঞেস করে, রজবের মুখেই বোধহয় আমাদের কাজ কারবারের কথা শুনেছ। এবার বলো পারবে এ কাজ?

নূর কিন্তু তখনও ঘোর অন্ধকারে। রজব আলী কিছুই বলেনি তাকে। কোন জবাব না দিয়ে সে কেবল তাকিয়ে থাকে জামিলের দিকে।

ক্যাপটেন জামিল নূরকে জিজ্ঞেস করে, লেখাপড়া কতদূর জানো?

একটা ঢোক গিলে জবাব দেয় নূর, বাংলা একটু-আধটু

লিখতে পড়তে পারি, জনাব।

—ইংরেজি?

—না, জানি না।

—উর্দু?

—সামান্য বলতে পারি, কিন্তু লিখতে পারি না।

—আমাদের এই কাজে রয়েছে বিপদের ঝুঁকি। সেই ঝুঁকি নিতে তোমার আপত্তি নেই তো?

—না জনাব, জবাব দেয় নূর, ব্যবসা করতে হলে তো বিপদের ঝুঁকি নিতেই হবে।

—আরে না—না, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে ক্যাপ্টেন জামিল, ঐ ঝুঁকির কথা বলিনি। টেরিলিন কাপড় চোপড়ের স্মাগলিং অর্থাৎ চোরা চালানের ব্যবসা করতে হবে তোমাকে। পয়সা কড়ি অবশ্যি আমরাই দেব। তুমি কেবল ঐসব জিনিস নিয়ে বর্ডারের ওপারে গিয়ে বিক্রি করবে। মোটা মুনাফা থাকবে তোমার।

এতক্ষণে ব্যবসার সঠিক অর্থ বুঝতে পারে নূর। কাপড় চোপড়ের ব্যবসা মানে চোরাচালান। এতে বিপদের ঝুঁকি যথেষ্ট।

নুর আবার জিজ্ঞেস করে, ব্যবসা করবো আমি, মুনাফা থাকবে আমার, আপনারা কেন শুধু শুধু আমার ব্যবসায় মূলধন জোগাবেন, জনাব?

নূরের কথায় ক্যাপ্টেন জামিল ও রজব আলী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে হেসে ওঠে। তারপর একসময় হাসি থামিয়ে ভ্রূ-ভঙ্গি করে বলতে থাকে ক্যাপ্টেন জামিল, শোন নূর, টেরিলিন কাপড়-চোপড়ের স্মাগলিং করলেও এটা তোমার প্রধান কাজ নয়। ওপারের অর্থাৎ হিন্দুস্থানী দুশমনদের যে ফৌজী ক্যাম্প রয়েছে ঐ ক্যাম্পের যাবতীয় খবর ঘুরে ঘুরে জোগাড় করতে হবে তোমাকে। কেমন করে জোগাড় করবে সে সব কায়দা কানুন তোমাকে আমরা শিখিয়ে দেব। এটাই তোমার প্রধান কাজ। এর জন্যে নিয়মিত টাকা পাবে তুমি। তুমি হবে একজন সাধারণ স্মাগলার, যেন টেরিলিনের কাপড় চোপড়ের চোরাকারবারই তোমার একমাত্র কাজ। এবার বুঝেছ?

এতক্ষণে গোটা ব্যাপারটাই জলের মত সহজ হয়ে ওঠে নূরের কাছে। গুপ্তচরবৃত্তি করতে হবে তাকে। পাকিস্তানী গুপ্তচর। ছদ্মবেশের আড়ালে থেকে ভারতীয় সৈন্য ছাউনীর খবরা-খবর জোগাড় করে এনে পৌঁছে দিতে হবে ক্যাপ্টেন জামিলের কাছে। বিষয়টা ভাবতেই কেমন যেন গা ছম ছম করতে থাকে নূরের। ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। তবে সেই গা ছম ছমের মধ্যেও কেমন যেন এক আনন্দ যা নাকি ঐ বয়সের যে কোন যুবকই অনুভব করে থাকে। বিপদের মধ্যে থ্রিল। তার সঙ্গে টাকাটা তো উপরি পাওনা।

এক কথায় জামিল সাহেবের প্রস্তাবে রাজি হয় নূর। ক্যাপ্টেন জামিল তাকে পরের দিন দেখা করতে বলে সেদিনের মত বিদায় দেয়। অজানা ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে দুরু দুরু বুকে জামিল সাহেবের মোকাম ছেড়ে বেরিয়ে আসে নূর। সঙ্গে রজব আলী।

এর পরে দিন কয়েক ধরে চলতে থাকে নূরের শিক্ষা। না, ঠিক শিক্ষা বলা চলে না। নূরের মত প্রায় অশিক্ষিত একটি যুবক এক দেশের হয়ে অন্যদেশে গুপ্তচর বৃত্তি করতে পারে না। এ যুগে গুপ্তচর বৃত্তি একটা বিজ্ঞানভিত্তিক কলাকৌশল—সায়েন্টিফিক আর্ট। এর জন্যে চাই যথেষ্ট বিদ্যা, প্রখর বুদ্ধি ও প্রচণ্ড সাহস।

আসলে নূরের মত যুবকদের গুপ্তচর না বলে ইনফর্মার বলাই উচিত। এদের জন্যে সরকারের দায়ও নেই, দায়িত্বও নেই। কিছু ভাল খবর জোগাড় হল তো নগদ বিদায়, নইলে কিছুই না। ব্যাস, এর বেশি দেশের সরকার এদের কাছ থেকে কিছু আশাও করে না।

এপারে অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানে যার নাম নূর ইসলাম, বর্ডারের ওপারে অর্থাৎ ভারতীয় ভূখণ্ডে তারই নাম দিলীপ দে। শুরু হল নূর ওরফে দিলীপের ইনফর্মারের কাজ। বর্ডার পার হওয়া কোন প্রশ্নই নয়। দীর্ঘ সীমান্তের সর্বত্র পাহারার ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া, পঞ্চম বাহিনীর লোকজন এবং পেশাদার পার-করনেওয়ালাও তৈরি। পঞ্চম বাহিনী অর্থাৎ বিদেশের চরেরা তো সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়িয়েই আছে, আর পেশা-

দারদের প্রসারিত হাতে কিছু দক্ষিণা গুঁজে দিলেই অনায়াসে ওপারে গিয়ে হাজির হওয়া চলে।

পাকিস্তানকে বিশ্বাস নেই। ১৯৬৫-তে তাসখন্দ চুক্তি না হলে তার কোমর ভেঙেই যেত। চুক্তির দৌলতে কোমর মোটামুটি সোজা থাকলেও কোমরের হাড়ে চিড় ধরেছিল। মালিশ করে সেই চিড় সারিয়ে আবার ভারতের ওপর যে কোন সময় সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কাজেই সদা-সতর্ক ভারতীয় সেনাবাহিনী। পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর তাদের শক্ত ঘাঁটি। প্রয়োজনে পাক-সৈন্যের মোকাবিলায় তারা সর্বদাই প্রস্তুত।

টেরিলিন কাপড় চোপড়ের স্মাগলারের ছদ্মবেশে নূর ওরফে দিলীপ সৈন্য ছাউনীর আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। ইসলামপুর, কিষেণগঞ্জ, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের কোথায় ভারতীয় সৈন্য ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে, কোথায় তাদের সদর দফতর, বিভাগীয় হেড অফিস কিম্বা ইউনিট অফিস কোথায়, কোথায় কি পরিমাণ সৈন্য মোতায়েন রয়েছে, কি ধরণের অস্ত্র রয়েছে তাদের হাতে ইত্যাদি খবর জোগাড় করতে নূর সর্বদাই সচেষ্ট। খবর মানেই টাকা। দিনাজপুরে ক্যাপ্টেন জামিলের কাছে খবর পৌঁছে দিতে পারলেই কড়কড়ে পাকিস্তানী বা ভারতীয় নোট। তাছাড়া কাপড়-চোপড়ের চোরাই ব্যবসা করেও মাঝে মধ্যে কিছু হাতে আসে।

কাজ মোটামুটি ভালই করছে নূর। ক্যাপ্টেন জামিল খুশি। বেশ দু'চার পয়সা হাতেও আসছে নূরের। সেই শালকরের দোকানে চাকরির চাইতে ঢের ভাল এই কাজ। বিপদের ঝুঁকি অবশ্যি আছে। তা, পয়সাকড়ি রোজগার করতে হলে একটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

কাজ যতই ভাল হোক, এভাবে ঘুরে ঘুরে খবর জোগাড় করতে আর ভাল লাগে না নূরের। মানুষ খেতে পেলে শুতে চায়। এরকম ঘোরাঘুরি না করে কোথাও স্থির হয়ে বসে খবরা-খবর জোগাড় করতে পারলে ভাল হত। তাছাড়া, দিনের পর দিন এভাবে ঘুরে বেড়াবার ধাক্কা সহ্য করাও তো সহজ নয়।

নূর ইসলামের যখন এমনি মনের অবস্থা ঠিক তখনই

বুড়িমারি সীমান্তের কাছে একটা রেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমে এক বর্ষার রাতে তার দেখা হয়ে গেল আব্দুল করিমের সঙ্গে। কেবল তা-ই নয়, সেই অপরিচিত আব্দুল করিম অযাচিত ভাবে তার নিজের মনের মত উপদেশই সেদিন দিয়েছিল তাকে। শিলিগুড়ি গিয়ে স্থির হয়ে বসে কাজকর্ম চালাতে বলেছিল। ওখানে নাকি খবর জোগাড় করার হাজারো পথ। রোজগারের সম্ভাবনাও নাকি বেশি।

গুপ্তচরই হোক আর ইনফর্মারই হোক, নিজের ইচ্ছেমত এলাকায় ঘোরাঘুরি করে খবর জোগাড় করার এক্তিয়ার তার নেই। তাতে বিপদও অনেক। কাজেই কর্তাদের না জানিয়ে নূরের পক্ষে শিলিগুড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কর্তারা কি তাকে সেই অনুমতি দেবে?

অবশেষে একদিন সাহস করে নূর কথাটা পেড়েই বসলে ক্যাপ্টেন জামিলের কাছে। শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ক্যাপ্টেন জামিল। তারপর জিজ্ঞেস করে, শিলিগুড়ি কখনও গিয়েছ?

জামিলের কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে নূর কেবল একটু হাসে।

নূরের মুখে হাসি দেখে ক্যাপ্টেন জামিল আবার জিজ্ঞেস করে, ওকি হাসছ যে?

তেমনি হাসিমুখে জবাব দেয় নূর, শিলিগুড়ি আমার জন্মস্থান।

—তাই নাকি? বলতে থাকে ক্যাপ্টেন জামিল, ওখানকার পথঘাট তুমি চেন?

—একটু একটু, জবাব দেয় নূর, খুব ছোটবেলায় শিলিগুড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলাম পার্বতীপুর। তবে, দু'চার দিন ঘোরা-ফেরা করলেই আবার সব মনে পড়বে।

ক্যাপ্টেন জামিল আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, ঠিক আছে, ভেবে দেখি। এখন যেমন করছো তেমনিই করতে থাকো।

॥ তিন ॥

মানুষ নিজের নাম দিয়ে পরিচিতি লাভ করে। সেই পরিচিতি আরও সঠিক হয়ে ওঠে তার পদবীর সাহায্যে। কিন্তু সময় সময় মানুষের পেশা সেই পদবীর কাজ করে। পদবী যায় হারিয়ে, পেশাই হয়ে ওঠে তার সঠিক পরিচিতির চিহ্ন—যেমন, অমুক মাস্টারের বাড়ি, কিম্বা অমুক ডাক্তারের চেম্বার ইত্যাদি।

বজরংবলী বরফওয়ালাকে শিলিগুড়ি সহরের অনেকেই চেনে। বেঁটে খাটো গোলগাল চেহারা বজরংবলীর। নাকের নীচে লম্বা একজোড়া গোঁফ। কোনকালে হয়তো সত্যিই সে বরফ বিক্রি করতো। সেই থেকে সে বরফওয়ালা। তার এই পেশাই তার পদবীকে মুছে দিয়েছে।

শিলিগুড়ি সহরের একপ্রান্তে বজরংবলী বরফওয়ালার বাড়ি। অনেকগুলো ঘর। মাত্র দু'খানা ঘর নিয়ে তার নিজের সংসার, বাকি ঘরগুলোয় সে ভাড়াটে বসিয়েছে। এ থেকে তার আয়ও হয় ভালই।

বজরংবলীর একখানা ঘরে ভাড়া থাকে দু'টি যুবক। ওদের একজনের নাম স্বপন চৌধুরী, অন্যজন দিলীপ দে। না, এই দিলীপ দের সঙ্গে নূর ইসলাম ওরফে দিলীপ দের কোন সম্পর্ক নেই। এই দিলীপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি।

স্বপন ও দিলীপ দু'জনই কলকাতা অঞ্চলের ছেলে। স্বপনের বাড়ি নৈহাটীতে, আর দিলীপের দমদমে। স্বপন বি. এ. পাশ, আর দিলীপ অনার্স সহ বি. এস. সি।

এই দু'জন শিক্ষিত যুবক দীর্ঘদিন ধরে চাকরির জন্যে ঘোরাঘুরি করে ব্যর্থ হয়ে শেষে একটা কোম্পানীর সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে এই শিলিগুড়ি সহরে এসে হাজির হয়েছে। কোম্পানীর নাম—শঙ্কর এ্যাণ্ড কোং। চিরুনী ও আলতার প্রস্তুতকারক এই কোম্পানী। গোটা উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি স্বপন ও দিলীপ। শিলিগুড়িতে বসেই তারা এই অঞ্চলে মাল সরবরাহ করে। এদের মালের চাহিদা ও কাটতিও নাকি প্রচুর।

দু'টি যুবকই মোটামুটি সুদর্শন। অতীতে দু'জনেরই দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। দেশ ভাগের পরে নৈহাটীতে বাড়ি করেছে স্বপনের বাবা। সেখানেই থাকে তার সৎমা ও সৎ ভাইবোনেরা। সৎমার সঙ্গে বনিবনা হয় না তার। তাই নাকি বাড়ির সঙ্গে স্বপনের তেমন একটা সম্পর্ক নেই।

দিলীপ লেখক ও কবি। সময় পেলেই নাকি সে গল্প কবিতা লেখে। এই রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরির আগে কোথায় কোন স্কুলে নাকি সে মাস্টারী করতো। কিন্তু গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাবার মত ছেলে ঠেঙিয়ে মানুষ করার কাজ তার ভালো লাগলো না। তাই সে চলে এল শিলিগুড়ি, সেই চিরুনী আলতা কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে।

একসঙ্গে থাকা খাওয়া, একসঙ্গেই ওঠা বসা এই দুই যুবকের। দিলীপ যদিও একটু গম্ভীর প্রকৃতির, স্বপন কিন্তু খুব মিশুক। পাড়ায় এই দু'টি যুবকের খুবই সুনাম। ঝুট ঝামেলায় তারা থাকে না। সত্যি বলতে কি, সেই সময়ও তাদের নেই। তারা নিজেদের কাজ কর্ম নিয়েই ব্যস্ত। তবে পাড়ার কোন অনুষ্ঠান কিম্বা পূজো পার্বনে মোটা চাঁদা দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মুখে হাসি ফোটাতে কিন্তু একটুও দ্বিধা নেই তাদের। বাড়িওয়ালা বজরংবলী বরফওয়ালা হয়তো বলে, আপনারা কলকাতার ছেলে, এই শিলিগুড়ির হাল-চাল জানেন না। ছেলে ছোকরারা তো চাঁদা চাইবেই। তাই বলে তারা যা চাইবে তাই দিতে হবে নাকি? এতগুলো টাকা চাঁদা না দিলেও পারতেন।

বজরংবলীর ভাঙা বাংলায় এ ধরনের উপদেশের জবাবে দিলীপের গম্ভীর মুখে হয়তো সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। স্বপন মৃদু হেসে হয়তো বলে, আমরা বাইরের লোক। এখানে ব্যবসা করে রোজগার করছি। কাজেই এরা চাঁদা চাইলে না বলি কি করে, বজরংবলীজী?

বজরংবলী বরফওয়ালা তার এই যুবক ভাড়াটে দু'জনকে নিয়ে খুবই খুশি। কোন ঝামেলা নেই এদের নিয়ে। পাত-কুয়োর জল নিয়ে যখন অন্য ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয় এবং শেষপর্যন্ত যখন পাতকুয়োর সংখ্যা বৃদ্ধি না করার জন্যে

সবটুকু দোষ এসে পড়ে বাড়িওয়ালার ঘাড়ে তখন এ: যুবক নিঃশব্দে নিজেদের এ্যাটাচি কেস নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে, জলের যখন অভাব তখন একটা দিন না হয় স্নান না করেই কাটিয়ে দেব। একদিন স্নান না করলে শরীর এমন কিছু খারাপ হয় না।

মাসের ঠিক প্রথম দিন বাড়িওয়ালার হাতে ভাড়ার টাকা তুলে দিতে তাদের ভুল হয় না। তাছাড়া অন্য ভাড়াটেদের বিপদে আপদে আর্থিক সাহায্য নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যেতেও দ্বিধা করে না তারা। কাজেই এই ধরনের মানুষ সকলেরই প্রিয়পাত্র।

দিলীপ ও স্বপনের ঘরখানাও বেশ সাজানো গোছানো। ঘরের মধ্যে দু'পাশে দু'খানা ছোট খাট। তার ওপর তাদে: বিছানা সুন্দর করে গোটানো। একটা ছোট বইয়ের আলমারী। এর মালিক দিলীপ। দু'খানা হালকা চেয়ার ও একটা টেবিল। ঘরের দেয়ালে মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলালের বাঁধানো ছবি। দরজার মাথার দিকে মা দুর্গার একখানা ছবি। কাজে বেরো-বার আগে মা দুর্গাকে প্রণাম করতে কোনদিন ভুল না হয় তাদের।

দেব-দ্বিজে যথেষ্ট ভক্তি এদের। বারোয়ারী সরস্বতী পুজোয় স্নান সেরে ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে অঞ্জলি দেবার জন্যে দিলীপ ও স্বপনই গিয়ে সর্বপ্রথম হাজির হয়। পাড়ার লোকেরা বলা-বলি করে—একালে এমন সৎ ছেলে প্রায় দেখাই যায় না। বাস্তবিকই অনুকরণ যোগ্য এদের আচরণ।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি। ট্রেনে এটুকু সামান্যই পথ। সন্ধ্যার ট্রেনে বেজায় ভিড়। নিউ জলপাইগুড়ির রেলের চাকুরেদের মধ্যে অনেকেই এই গাড়িতে বাড়ি ফেরে। তার ওপর সেদিন একদল ছাত্র নিউ জলপাইগুড়িতে ফুটবল খেলে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ি ফিরছিল। শিলিগুড়ির স্কুলের ছাত্র রমেন সাহাও ছিল তাদের মধ্যে।

ছোট্ট কম্পার্টমেণ্টের বেঞ্চগুলোর অধিকাংশই দখল করে রেখেছিল সেই খেলোয়াড়েরা। নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা, হৈ-চৈ করে আসর সরগরম করে রেখেছিল তারা। দাঁড়িয়ে থাকা বয়স্ক যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ মুখের ওপর গাম্ভীর্যের আবরণ টেনে

ছোকরাদের কথাবার্তা না শোনার ভান করে বিরক্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল। কেউ বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিল তাদের কথাবার্তা।

গ্রীষ্মকাল। কম্পার্টমেণ্টের এককোণে দাঁড়িয়ে ঘামছিল দিলীপ। হাতে এ্যাটাচি কেস। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে দারুণ পরিশ্রান্ত সে। একটু বসতে পারলে ভাল হত। নিদেন পক্ষে কেউ যদি তার ভারী এ্যাটাচি কেসটা একটু ধরতো তাহলেও না হয় একটু আরাম পেত।

বেঞ্চের একপাশে বসেছিল রমেন, আর তার গা-ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল দিলীপ। মনে মনে ভাবছিল, এই ছেলেটিকে তার এ্যাটাচি কেসটা ধরতে বলবে কিনা।

দিলীপের ভাবভঙ্গি দেখে রমেন বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে সে খুব ক্লান্ত। সহসা সে উঠে দাঁড়িয়ে দিলীপকে বললে, আপনি দাদা এখানে বসুন।

দিলীপ চমকে তাকায় রমেনের দিকে। তারপর বললে, তুমি ভাই দাঁড়িয়ে যাবে নাকি?

সলজ্জ কণ্ঠে রমেন জবাব দেয়, না—না, আমার কোন অসুবিধে হবে না। আপনি বসুন।

এ ধরনের সহানুভূতি আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। বিস্মিত দিলীপ আপত্তি জানায়, তা কি করে হয় ভাই? তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আমি বসবো?

এই সময় পাশের আর একটি ছেলে দিলীপকে বললে, বসুন না আপনি। দু'জনেই বসতে পারবেন এখানে। কথাটা বলেই ছেলেটি একটু চেপে বসে মোটামুটি দু'জনের জন্যেই বসার জায়গা করে দেয়। দিলীপ আর আপত্তি করে না।

গাড়ি চলছে। দিলীপ রমেনকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় থাকো ভাই?

রমেন তার শিলিগুড়ির ঠিকানা বলতেই দিলীপ বলে ওঠে, ও—তাই নাকি? আমি তো প্রায়ই ওদিকে যাই।

—আপনি থাকেন কোথায়? জিজ্ঞেস করে রমেন।

দিলীপ তার ঠিকানা বলতেই রমেন আবার জিজ্ঞেস করে, কার বাড়িতে থাকেন?

ংবলী বরফওয়ালার বাড়। জবাব দেয় দিলীপ।

—রেলে চাকরি করেন বুঝি?

—না ভাই, বলতে থাকে দিলীপ, এ বাজারে আর চাকরি পাবো কোথায়? সামান্য ব্যবসা করি। তা ভাই, তোমার নামটা তো জানা হল না।

—আমার নাম রমেন সাহা। আপনার?

—দিলীপ দে।

—স্কুলে পড়ো বুঝি?

—হ্যাঁ, ক্লাশ নাইনে।

—শিলিগুড়ি থেকে নিউ জলপাইগুড়িতে তোমরা রোজ খেলতে যাও নাকি?

মৃদু হেসে জবাব দেয় রমেন, না—না, রোজ যাই না। আজ একটা ম্যাচ ছিল।

—জিতলে?

—না, ড্র। কোন গোল হয় নি।

—কোন পজিশনে খেলো তুমি?

—ব্যাকে।

একটু সময় চুপ করে থেকে দিলীপ আবার বললে, আমিও ব্যাকে খেলতাম।

—শিলিগুড়িতে?

—না—না, এখানে আর খেলার সুযোগ কোথায়? কলকাতায়।

—কলকাতায়? ওখানেই বুঝি আপনাদের বাড়ি?

—হ্যাঁ, তবে ঠিক কলকাতায় নয়, দমদমে।

—কোন্ টিমে খেলতেন?

—সামান্য একটা লোক্যাল টিমে। কথাটা বলেই চুপ করে থাকে দিলীপ।

হোক লোক্যাল টিম। তবুও তো ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতার ফুটবল প্লেয়ার। ক্লাশ নাইনের ছাত্র রমেন খানিকটা সম্ভ্রমমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দিলীপের মুখের দিকে।

ট্রেন শিলিগুড়ি স্টেশনে ঢুকতেই ছেলের দল হৈ-হৈ করে নেমেপড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। উঠে দাঁড়ায় রমেন ও দিলীপ।

রমেন দিলীপকে বললে, এবার তা হলে চলি।

[illegible] জবাব দেয় দিলীপ। তারপর আবার বললে, আমাদের পাড়ায় এলে আমার ওখানে এসো।

—আচ্ছা। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে রমেন তার বন্ধুদের সঙ্গে নমে যায়।

॥ চার ॥

মনোরঞ্জন সরকারের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পাতলা দোহারা গড়ন। গোঁফ দাড়ি কামানো। মাথার পেছন দিকে উঁকি দিচ্ছে ছোট একটি টাক। কথা বলার সময় সেই টাকে হাত বুলানো তার মুদ্রাদোষ। এ নিয়ে তার অফিসের ঊর্ধতন অফিসারেরা তাকে ধমকায়, বন্ধুরা হাসি-মস্করা করে, কিন্তু মনোরঞ্জন ছাড়তে পারে না এই অভ্যাস।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। নিজের বিছানায় আধশোয়া হয়ে ছিল দিলীপ, আর সামনে একটা চেয়ারে বসে তার সঙ্গে কথা বলছিল মনোরঞ্জন।

দিলীপ বলছিল মনোরঞ্জনকে, স্বপন না হয় না-ই আছে বাড়িতে। তাই বলে কি আপনি এসেই চলে যাবেন? কেন, আমি তো আছি। না হয় দু'দণ্ড আমার সঙ্গেই গল্প করলেন।

মনোরঞ্জন হেসে জবাব দেয়, না—না, এ কী বলছেন? আমার কাছে স্বপনবাবুও যা, আপনিও তাই। একটু বিশেষ দরকার ছিল স্বপনবাবুর সঙ্গে।

—দরকার তো বটেই। হেসে বলে ওঠে দিলীপ, দরকারটা যদি খুব গোপনীয় না হয় তাহলে আমাকে বলে যেতে পারেন। স্বপন ফিরে এলে তাকে বলবো।

—না—না, তেমন কিছু নয়। কথা বলতে বলতে একটু শুকনো হাসি হাসে মনোরঞ্জন। তারপর অবার বললে, ঠিক আছে, আমি বিকেলের দিকেই না হয় আবার আসবো।

দিলীপ বুঝতে পারে মনোরঞ্জন তার কাছে কোন কথাই প্রকাশ করতে রাজি নয়। তাই সে আবার বললে, তা দাদা এককাপ চা খেয়ে যাবেন তো?

—না—না ভাই, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলতে, থাকে মনোরঞ্জন, স্বপনবাবুর সঙ্গে যখন দেখাই হলো না তখন এদিকের একটু অন্য কাজ সেরে বাড়ি ফিরবো।

দিলীপ আর চা খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে না মনোরঞ্জনকে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় মনোরঞ্জন। দিলীপ বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বুকের তলায় বালিশ রেখে নিজের ডাইরীতে যেন কি লিখতে থাকে।

একটু পরেই দরজার কাছে ভেসে ওঠে কণ্ঠস্বর, দিলীপদা।

চমকে উঠে দরজার দিকে তাকায় দিলীপ। স্মিত মুখে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে রমেন।

ডাইরী বন্ধ করে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নেমে আসে দিলীপ। তারপর বলে ওঠে, আরে রমেন যে! এসো—এসো—।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রমেন বলতে থাকে, এদিকে এসেছিলাম এক বন্ধুর বাড়িতে একটা বই নিতে। হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়লো। তাই চলে এলাম।

—বেশ করেছো। তা, কি খবর, বলো? পড়াশোনা কেমন চলছে? নাকি কেবল ফুটবল খেলেই বেড়াচ্ছো? কথাটা বলেই হেসে ওঠে দিলীপ।

লজ্জিত কণ্ঠে জবাব দেয় রমেন, ফুটবল অবশ্যি খেলছি। তবে পড়াশোনাও করছি।

—হ্যাঁ ভাই, তাই করো। মনে রেখো, যত বড় ফুটবলারই হও না কেন, লেখাপড়া না শিখলে বড় হওয়া যায় না।

দিলীপের কথায় রমেন মাথা নীচু করে হাতের বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। তারপর একসময় মাথা তুলে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দিলীপদা, কী ব্যবসা আপনার?

জবাবে দিলীপ বললে, আমার ব্যবসা নয়, একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি।

—কিসের ব্যবসা?

—চিরুনি, আলতা সিঁদুর, এসব আর কি।

—এখানেই তৈরী হয়?

—না না, কলকাতায়।

—কি নাম আপনাদের কোম্পানীর?

—শঙ্কর এণ্ড কোং।

—এখানে-সেখানে ঘুরতে হয় বুঝি আপনাকে?

—হ্যাঁ, প্রথম প্রথম খুবই ঘুরতে হত। এখন এখানে বসে বসেই অর্ডার জোগাড় করি।

রমেন ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, এখানে আর কেউ থাকে নাকি?

জবাব দেয় দিলীপ, হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু স্বপন চৌধুরীও এখানে থাকে। আমরা ত্ব'জনেই কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ।

—আমাদের এখানে আপনাদের মালের বুঝি খুব বিক্রি?

মৃত্ব হেসে দিলীপ বললে, হ্যাঁ মন্দ নয়। আমাদের কোম্পানীর মাল তুমি কখনও দেখেছো?

মাথা নেড়ে জবাব দেয় রমেন, না।

দিলীপ তার এ্যাটাচি কেস খুলে সিলোফিন কাগজে মোড়া কয়েকখানা চিরুনি, আলতা ও সিঁত্বরের প্যাকেট বের করে রমেনের সামনে রেখে বললে, এই দেখ, আমাদের কোম্পানীর মাল।

রমেন সাগ্রহে জিনিসগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললে, বাঃ, প্যাকেটগুলো তো চমৎকার।

হেসে দিলীপ বললে, কেবল প্যাকেটগুলোই নয়, ভেতরের জিনিসের কোয়ালিটিও ভালো।

রমেন জিনিসগুলো একপাশে সরিয়ে রাখতেই দিলীপ বলে ওঠে, সরিয়ে রাখলে কেন? এগুলো তোমার।

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে জবাব দেয় রমেন, এসব আলতা-সিঁত্বর নিয়ে আমি কী করবো?

—কেন, বাড়ি নিয়ে যাও। তোমাদের বাড়ির মেয়েরা ব্যবহার করবে।

—এসব ব্যবহার করার মত তো কেউ আমাদের বাড়িতে নেই।

—কেন, তোমার মা? তিনি এসব ব্যবহার করেন না?

একটু শুকনো হাসি হেসে জবাব দেয় রমেন, মা তো এখানে থাকেন না। মা ও বাবা নেফা থাকেন। বাবা সেখানে চাকরি করেন।

—তাই নাকি? তা, এখানে কে থাকে?

—আমি আর আমার ছোট ভাই। আর আছে আমাদের দুই দিদি।

একটু চিন্তা করে দিলীপ আবার বললে, বেশ তো, এগুলো না হয় তারাই ব্যবহার করবে।

হেসে জবাব দেয় রমেন, দিদিদের তো বিয়েই হয় নি। আপনার এই সিঁদুর ব্যবহার করবে কে?

—বেশ, সিঁদুর ব্যবহার না করুক আলতা-চিরুনি তো ব্যবহার করে তারা।

—না দিলীপদা, বলতে থাকে রমেন, আজকাল মেয়েরা তো আলতা পরে না। আমার মা অবশ্যি আলতা পরতেন। তবে দিদিরা আপনার এই চিরুনি ব্যবহার করতে পারবে।

—হ্যাঁ, সবগুলোই বাড়ি নিয়ে যাও। ব্যবহার না করে তো অন্য কাউকে দিয়ে দেবে।

—শুধু শুধু আপনি এগুলো নষ্ট করবেন?

হেসে জবাব দেয় দিলীপ, নষ্ট হবে কেন? কেউ না কেউ তো ব্যবহার করবেই। এগুলো স্যাম্পল। প্রচারের জন্যে এমনি স্যাম্পল আমাদের এমনিতেই বিলোতে হয়।

রমেন আর আপত্তি করে না। একসময় প্যাকেটগুলো হাতে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায় দিলীপকে বললে, আমি এবার চলি দিলীপদা।

—এসো। দিলীপ বললে, এদিকে এলে আবার এসো।

—হ্যাঁ আসবো। তবে আপনিও একদিন যাবেন আমাদের বাড়িতে।

মৃদু হেসে জবাব দেয় দিলীপ, আচ্ছা—আচ্ছা। ওদিকে গেলে তোমাদের বাড়ি নিশ্চয়ই যাবো।

কথা দিয়েও কিন্তু রমেনদের বাড়ি আর যাওয়া হয়নি দিলীপের। আবার একদিন রমেনের সঙ্গে রাস্তায় তার দেখা হতেই রমেন অনুযোগের সুরে বললে, কি দিলীপদা, যাবেন

না যে আমাদের বাড়িতে ?

—হ্যাঁ ভাই, নিশ্চয়ই একদিন যাবো। ঠিক যাবো।

অবশেষে একদিন বিকেলে দিলীপ এসে হাজির হয় রমেনদের বাড়িতে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে রমেনের নাম ধরে ডাকতেই শাড়ি-পরা একটি তরুণী বেরিয়ে এসে বললে, ভাই দোকানে গেছে। কোন দরকার আছে তার কাছে ?

আমতা আমতা করে জবাব দেয় দিলীপ, না, ঠিক দরকার নয়। তবে—।

দিলীপের কথা শেষ হবার আগেই রমেনের সেই ছোড়দি শেফালী বলে ওঠে, আপনি ভেতরে এসে বসুন। ভাই এখনই এসে পড়বে।

দিলীপকে ইতস্তত করতে দেখে শেফালী আবার কি যেন বলতে যায়, কিন্তু তার আগেই রাস্তার মোড়ে রমেনকে দেখতে পেয়ে বলে ওঠে, ঐ তো ভাই এসে পড়েছে।

রমেনের হাতে একটা ঠোঙা। এগিয়ে এসে দিলীপকে দেখেই সে হাসিমুখে বলে ওঠে, আরে, দিলীপদা যে! আসুন ভেতরে আসুন। তারপর শেফালীর দিকে তাকিয়ে সোৎসাহে বললে, চিনতে পারলি না ছোড়দি, এই তো সেই দিলীপদা। সেদিন সেই আলতা-চিরুনি দিয়েছিল।

—আমি কেমন করে চিনবো ? কথাটা বলেই শেফালী ঘুরে দাঁড়ায়। তার পিছে পিছে ঘরে ঢোকে রমেন ও দিলীপ।

শেফালীর বয়স সতেরোর বেশী নয়। দেখতে মোটামুটি। গায়ের রং ফর্সা, মুখে চোখে চঞ্চলতার ছাপ। সেই চঞ্চলতা তার চলাফেরার মধ্যেও ফুটে ওঠে। কথাবার্তা একটু কাটকাট।

বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ায় দিলীপ। রমেন তার হাতের ঠোঙা নামিয়ে রাখতে ছুটে রান্নাঘরে চলে যেতেই শেফালী দিলীপের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে ওঠে, ওকি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসার জন্য তো চেয়ার রয়েছে। বসুন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বসছি। অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে চেয়া-রের দিকে এগিয়ে যায় দিলীপ।

রমেনের বড়দি অনুভা ছিল পাশের ঘরে। ছোটবোন শেফালীর কণ্ঠস্বরে বাইরের ঘরে এসে অপরিচিত দিলীপকে দেখেই ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে ওঠে শেফালী, ভাইয়ের

সেই দিলীপদা।

—ও, তাই বুঝি। কথাটা বলেই ভেতরে চলে যায় অনু। শেফালী কিন্তু অসঙ্কোচে শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে ন্যাকড়া দিয়ে জানালার ঝুল ঝাড়তে থাকে।

রমেন এসে দিলীপের পাশে বসতেই দিলীপ বললে, আমি ভাবতে পারিনি তোমাকে এই সময় বাড়িতে পাবো।

হেসে জবাব দেয় রমেন, হ্যাঁ, আব একটু পরে এলে আর পেতেন না। খেলতে চলে যেতাম।

—তা'হলে আমি এসে তোমার খেলা নষ্ট করলাম, কি বল?

—না না, একদিন না খেললে আর কি এমন যাবে আসবে?

এরপরে দিলীপ ও রমেন ডুবে যায় ফুটবল নিয়ে আলোচনার মধ্যে। এরই মধ্যে একসময় শেফালী এসে চা বিস্কুট দিযে যায় দিলীপকে।

রমেনের সঙ্গে কথা বললেও দিলীপ মনে মনে আর একবার অনুভা অর্থাৎ অনুকে দেখবার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু তা আর হলো না। আর এঘরে এলো না অনু। তার গায়ের রং অবশ্যি ছোটবোন শেফালীর মত ফর্সা নয়, কিন্তু ঢলঢলে মুখখানায় এমন এক অপূর্ব শ্রী যা নাকি মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করে। পূর্ণ যুবতী অনুর টানা টানা চোখজোড়ার দৃষ্টি শান্ত ও স্নিগ্ধ। সেই সঙ্গে যেন মিশে রয়েছে খানিকটা শঙ্কা যা নাকি ভয়-চকিত হরিণীর চোখের দৃষ্টিকে মনে করিয়ে দেয়।

সেই শুরু। প্রথম পরিচয়, পরে ঘনিষ্ঠতা ইদানীং সময় পেলেই দিলীপ এসে হাজির হয় রমেনদের বাড়ি। এমনকি রমেন বাড়ি না থাকলেও সে আসে। তার কাছে এবাড়ির দরজা এখন অবারিত। কোনদিন হয়তো সন্ধ্যার সময় একটা মাছ নিয়ে এসে হাজির হয়। মাছ দেখে শেফালী হয়তো আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠে। বলে, দিলীপদা দেখছি হাত গুণতে জানে।

—তার মানে? প্রশ্ন করে দিলীপ।

জবাব দেয় শেফালী, আপনি বুঝি হাত গুণে টের পেয়েছেন যে আজ দু'দিন ধরে আমরা মাছের মুখ দেখতে পাইনি। দু'বেলা কেবল আলু-চচ্চড়ি চলছে।

অনু হয়তো ভ্রু-ভঙ্গি করে ধমক দেয় ছোট বোনকে, কী

হচ্ছে শেফালী ?

—বারে, দিলীপদা তো ঘরের লোক। ওকে বলতে কী আছে ? বলতে থাকে শেফালী, আজ দু'দিন ধরে ভাইয়ের জ্বর। বাজার করার লোক নেই। কাজেই আলু-চচ্চড়ি ছাড়া আর উপায় কি ?

দিলীপ এই সময় অনুযোগের সুরে হয়তো অনুকে বলে, এ তোমার ভারি অন্যায়, অনু। রমেনের জ্বর, আমাকে একটা খবর দিলেও তো পারতে।

অনু কোন জবাব না দিয়ে স্নিগ্ধ চোখে একবার দিলীপের দিকে তাকিয়ে মাছ নিয়ে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

সেদিন রাতে একেবারে খেয়েদেয়েই নিজের ডেরায় ফেরে দিলীপ।

দিলীপের প্রবাসী জীবনে এই পরিবারটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা যেন উষর মরুভূমিতে এক শ্যামল মরুদ্যান। দিলীপের এই ঘনিষ্ঠতার কেন্দ্রবিন্দু যে অনু ছাড়া আর কেউ নয় এটা পাড়া-প্রতিবেশীদের মত অনুদের পরিবারের লোকেরাও বোঝে। শেফালী তো আনন্দে উচ্ছ্বসিত। তার দিলীপদা বাস্তবিকই সুপুরুষ। এমন একজন যুবক যদি তার দিদির ভাগ্যে জোটে তাহলে তার দিদির বরাতকে ভালই বলতে হবে।

অনুদের পরিবার বলতে তারা নিজেরা চার ভাই-বোন ছাড়া তাদের এক পিসীমা। এই বৃদ্ধা মহিলা কেবল নামেই এই পরিবারের গার্জেন। সংসার চালাতে হয় অনুকেই। নেফা থেকে বাবার পাঠানো টাকা বুঝেসুঝে খরচ করতে হয় তাকে।

শেফালী যেমন লাজ-লজ্জার তেমন একটা ধার ধারে না, তেমনি অনু একটু বেশি পরিমাণে লাজুক। দীর্ঘ এক বছরের বেশি ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও অনু এখনও দিলীপকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে। এ নিয়ে শেফালী মাঝে মধ্যেই ঠাট্টা করে তার দিদিকে। বলে, তুই চিরকালই এই আপনি-আজ্ঞে চালাবি নাকি দিদি ?

অনু মিষ্টি ধমক দেয় ছোটবোনকে। বলে, বড্ড ফাজিল হয়েছিস তুই।

খিলখিল করে হেসে উঠে জবাব দেয় শেফালী, বারে জিজ্ঞেস করলেও দোষ ? শুনতে পাই সেকালে নাকি এমনি

আপনি-আজ্ঞে চলত।

—আবার! দেখাচ্ছি তোকে মজা। কথাটা বলেই অনু বোনের দিকে এগিয়ে যেতেই শেফালী হাসতে হাসতে পালিয়ে যায় সেখান থেকে।

হালকা চরিত্রের মেয়ে শেফালী মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করে বসে যে সেই মুহূর্তে লজ্জায় মরে যায় অনু। কোনদিন হয়তো ভাইয়েরা কেউ বাড়ি নেই, পিসীমা হয়তো গেছে কোন পড়শীর বাড়ি। বাড়িতে কেবল অনু ও শেফালী। সেই মুহূর্তে দিলীপ এসে হাজির হয়। দিলীপকে দেখেই শেফালীর মুখখানা দুষ্টুমিতে ভরে ওঠে। দিলীপ বলে শেফালীকে, অমন ছটফট করে ঘুরছো কেন? দু'দণ্ড বসো না আমার কাছে। গল্প করি।

জবাবে শেফালী বলে, আপনার সাথে গল্প করতে আমার বয়েই গেছে। আমার বলে কাজের অন্ত নেই। কথাটা শেষ করেই শেফালী একদৌড়ে ভেতরে গিয়ে শাড়ি পাল্টে এসে দাঁড়ায়।

—ওকি, কোথায় চললে? জিজ্ঞেস করে দিলীপ।

—এক বান্ধবীর বাড়িতে। একটু দরকার আছে। মুখ টিপে হেসে জবাব দেয় শেফালী।

বিব্রত সুরে অনু বলে, আমি একা বাড়িতে, আর তুই চললি?

—একা কোথায়? দিলীপদা তো আছে। তেমনি মুখ টিপে হেসে দিলীপের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে শেফালী, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরবো। এইটুকু সময় দিদিকে পাহারা দিতে পারবে না, দিলীপদা?

চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটিয়ে তুলে দিলীপ কেবল একটু সলজ্জ হাসি হাসে। বোনের কথার ধরনে লজ্জা পেয়ে ভেতরে চলে যায় অনু।

পায়ে স্যাণ্ডাল গলিয়ে কাঁধের আঁচল ঠিক করতে করতে দিলীপকে শুনিয়ে চাপা কণ্ঠে শেফালী বলে, ভরসা আছে বলেই না বেড়ালকে মাছের পাহারায় রেখে যাচ্ছি। কি বলো দিলীপদা?

দিলীপ কোন জবাব না দিয়ে কেবল মৃদু হাসে।

এমনি এক দিনেই অনুকে ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল দিলীপের। সেদিনই প্রথম ব্রীড়াসঙ্কুচিত অনুকে নিজের

বুকের ওপর টেনে নিয়ে তার পাতলা ঠোঁট জোড়া রাঙিয়ে দিয়েছিল দিলীপ। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে উচ্চারণ করেছিল সেই যাদুমন্ত্র—অনু—আমার অনু, আমি তোমায় ভালবাসি।

বলবো না বলবো না করেও দিলীপ একদিন কথাটা বলেই ফেলেছিল বন্ধু স্বপনকে। অবশ্যি এর আগে স্বপন নিজেই দিলীপের চালচলন, কথাবার্তায় খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে এরকমই একটা কিছু সন্দেহ করেছিল।

দিলীপের কথায় খানিকক্ষণ চুপ করে রইল স্বপন। তারপর বললে, যা করছো করো। বাধা দেব না। তবে এমন কিছু করতে যেওনা যাতে নিজের আসল কাজ-কর্মে বাধার সৃষ্টি হয়। ভুলে যেও না, কি কাজ নিয়ে এখানে এসে ডেরা বেঁধেছো।

—আরে না না, হালকা সুরে বলে ওঠে দিলীপ, আমাকে কি এতই আহাম্মক পেয়েছ? এতে হয়তো কাজকর্মের সুবিধেই হবে।

—হলেই ভাল। নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে স্বপন।

॥ পাঁচ ॥

এতদিনে পূর্ণ হলো নূর ইসলামের ইচ্ছা। দিনাজপুরের পাকিস্তান গুপ্তচর বাহিনীর ক্যাপ্টেন জামিল একদিন তাকে ডেকে বললে, শোন নূর, ওপরওয়ালাদের বলে কয়ে রাজি করিয়েছি। তোমাকে শিলিগুড়িতেই পাঠানো হবে। ওখানে আমাদের যে গুপ্তচর চক্র আছে তাদের সঙ্গেই কাজ করতে হবে তোমাকে।

আনন্দে মনটা নেচে ওঠে নূরের। যাক এতদিন পরে জীবনে একটা স্থিতি হতে চলেছে তার। আজ এখানে কাল ওখানে এভাবে ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করার চাইতে শিলিগুড়ির মত একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসে কাজ করা কেবল লাভজনকই নয়, এর ইজ্জৎও বেশি। তাছাড়া, নিজের জন্মস্থানের মাটিতে পা

ফেলবার সুযোগও ঘটবে।

দিন কয়েকের মাত্র ট্রেনিং। তারপরেই নূরের ওপর নির্দেশ হলো শিলিগুড়ি গিয়ে পাক গুপ্তচর চক্রের লেফটেনান্ট ফজলুর রহমান ও লেফটেনান্ট আব্দুল করিমের নির্দেশ মত কাজ করতে। শিলিগুড়ির ঠিকানাসহ তাদের ছদ্মনামও জানিয়ে দেয়া হলো তাকে।

অবশেষে একদিন সকালে ট্রেন থেকে শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে নামলো নূর। সেখান থেকে সাইকেল রিক্সায় চেপে সোজা চলে এলো সহরের খালপাড়ায়।

এই খালপাড়াতেই বজরংবলী বরফওয়ালার বাড়ি। ফজলুর ও আব্দুলের ছদ্মনামের সাহায্যে ঐ বাড়িরই এক ভাড়াটের ঘরে যখন নূর এসে উপস্থিত হলো তখন সেখানে হাজির ছিল পাক-গুপ্তচর চক্রের অন্যতম নায়ক ফজলুর রহমান। সহ-নায়ক আব্দুল করিম ছিল বাইরে।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ফজলুর এসে দরজা খুলতেই নূর জিজ্ঞেস করে, দিলীপবাবু ও স্বপনবাবু কি এখানে থাকে?

নূরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে তার আপাদমস্তক ভালোমত লক্ষ্য করে ফজলুর পাল্টা প্রশ্ন করে, কোন্ দিলীপ-বাবু স্বপনবাবুর কথা বলছেন?

জবাব দেয় নূর, দিলীপ দে ও স্বপন চৌধুরী।

—কি করে তারা? ফজলুরের চোখে সন্দেহাকুল দৃষ্টি।

—শঙ্কর এ্যাণ্ড কোম্পানীর রিপ্রেজেণ্টেটিভ। জবাব দেয় নূর।

—কিসের ব্যবসা তাদের?

—চিরুনি, সিঁদুর, আলতার।

একটু দ্বিধা করে ফজলুর। তারপর বললে, হ্যাঁ আমিই দিলীপ দে। আপনি কে? কোত্থেকে আসছেন?

ট্রেনে সারারাত জেগে কাটাতে হয়েছে নূরকে। তাই এমনি ভাবে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না তার। ফজলুরের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে বললে, দরকারী কথা আছে, ভেতরে চলুন।

ফজলুরের পিছে পিছে ঘরে ঢুকে নূর নিজেই দরজা ভেজিয়ে দেয়। তারপর একটা চেয়ারে বসে বললে, তাহলে আপনিই দিলীপ দে ওরফে ফজলুর রহমান?

চমকে ওঠে ফজলুর। নূরের কথায় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তার চোখজোড়া। চাপা দৃঢ় কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে, কে আপনি? কি দরকার আপনার?

জবাব দেয় নূর, আমিও একজন দিলীপ দে। এই নামেই এতকাল কাজ করে এসেছি। আসল নাম নূর ইসলাম।

—কোত্থেকে এসেছেন? জিজ্ঞেস করে ফজলুর।

—দিনাজপুর থেকে।

নূরকে কিন্তু তখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না ফজলুর। গুপ্তচর বৃত্তির প্রথম শিক্ষাই হচ্ছে কাউকে চট করে বিশ্বাস না করা। যে কোন মুহূর্তে গুপ্তচরবৃত্তির ওপর পাল্টা গুপ্তচরবৃত্তি ঘটতে পারে। চোরের ওপর বাটপাড়ির মত এস্‌পিওনেজের ওপর কাউন্টার-এস্‌পিওনেজ।

ফজলুর আবার জিজ্ঞেস করে, কে আপনাকে দিনাজপুর থেকে এখানে পাঠিয়েছে?

হালকা সুরে জবাব দেয় নূর, দিনাজপুরের 'মামা'।

—কি নাম মামার?

—মেজর লতিফ।

অবিশ্বাসের কুয়াশা খানিকটা কেটে যায় ফজলুরের। পাকিস্তানী গুপ্তচর বাহিনীর দিনাজপুর অঞ্চলের কর্তা মেজর লতিফের কোড নাম বাস্তবিকই 'মামা'। তবুও নিঃসন্দেহ হবার জন্যে ফজলুর আবার বললে, দেখুন, আপনার এখানে আসার বিষয়ে ওপার থেকে আমারা কোন খবর পাইনি। আপনি কোন কাগজ-পত্র সঙ্গে এনেছেন?

মৃদু হেসে নূর বললে, না। এসব কাগজ-পত্র সঙ্গে নিয়ে বর্ডার পার হওয়া বিপজ্জনক।

—তা বটে। নূরকে সমর্থন করে ফজলুর। তারপর আবার বললে, দিলীপ দের আসল নাম না হয় ফজলুর রহমানই হলো, কিন্তু বলতে পারেন স্বপন চৌধুরীর আসল নাম কি?

জবাব দেয় নূর, আব্দুল করিম।

—দিনাজপুরে নতুন রিক্রুট হয়েই এখানে এসেছেন?

—না, ঠিক নতুন রিক্রুট নয়। আগে বেশ কিছুদিন বর্ডার পার হয়ে হিন্দুস্থানের খবরাখবর জোগাড় করে ওপারে পৌঁছে

দিয়েছি। অবশেষে কর্তারা আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে।

—আমাদের হেড কোয়ার্টারে কখনও গিয়েছেন?

—ঢাকার কথা বলছেন?

মাথা নেড়ে সায় দেয় ফজলুর।

জবাব দেয় নূর, না, সে সুযোগ পাইনি।

—হেড্ কোয়ার্টারের কর্তার নাম জানেন?

নূর বুঝতে পারে তার পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। লেফটেনান্ট ফজলুর রহমান এখনও তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না।

মৃদু হেসে জবাব দেয় নূর, ব্রিগেডিয়ার সেলিম।

—তাঁর কোড নাম জানেন?

—শিকদার।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢোকে স্বপন চৌধুরী ওরফে লেফটেনান্ট আব্দুল করিম। হাতে তার খাবারের ঠোঙা। ঘরের মধ্যে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে ফজলুরকে কথা বলতে দেখে প্রথমটায় একটু থমকে যায় সে। বলে ওঠে ফজলুর, এই যে, এসে গেছ। তারপর কণ্ঠস্বর নামিয়ে আবার বললে, ইনি ওপার থেকে এসেছেন।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নূরের কথাটা কানে গিয়েছিল আব্দুলের। তাই সে ঘরের অন্যপ্রান্তে গিয়ে একটা থালায় খাবারের ঠোঙাটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে, খোদ 'শিকদার' পাঠিয়েছেন নাকি?

জবাব দেয় ফজলুর, না শিকদার নয়, মামা।

গায়ের জামার বোতাম খুলতে খুলতে এবার এগিয়ে আসে আব্দুল। নূরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার ভুরুজোড়া কুঁচকে ওঠে। তারপর বললে, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?

হেসে ওঠে নূর তারপর হাসতে হাসতে বললে, চিনতে পারলেন না তো? আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি।

তারপর গলা নামিয়ে আবার বললে, আপনিই তো আব্দুল করিম?

আব্দুল চুপ করে থাকে। বলতে থাকে নূর, দিনাজপুরের মামা যখন বললে আমাকে এখানে এসে লেফটেনান্ট ফজলুর রহমান ও লেফটেনান্ট আব্দুল করিমের সঙ্গে কাজ করতে হবে তখনই একবার আপনার কথা মনে হয়েছিল।

বিব্রত ভঙ্গিতে বলে ওঠে আব্দুল, কিন্তু এখনও ঠিক মনে করতে

পারছি না কোথায় আপনাকে দেখেছি।

আবার হেসে ওঠে নূর। হাসতে হাসতে বললে, মনে নেই আপনার? সেই বর্ষার রাতে বুড়িমারি সীমান্তের একটা রেলস্টেশনে গভীর রাতে—।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার, বলে ওঠে আব্দুল, পাশাপাশি শুয়ে রাতভোর কথা বলেছিলাম আমরা।

নূর আবার বললে, আপনি সেদিন আমাকে এখানে এসে কাজ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, মনে আছে ভাইজান?

মাথা নেড়ে সাড়া দেয় আব্দুল। বলতে থাকে নূর, আপনার সেদিনের সেই কথার ওপর ভরসা করেই তো চেষ্টা তদ্বির করে এখানে এসে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।

—ভালো করেছেন, আব্দুল বললে, কিন্তু আপনার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।

—নূর—নূর ইসলাম।

—ঠিক—ঠিক। নূর ইসলাম। তবে ভাই, এখানে কাজ করতে হলে আপনাকেও আমাদের মত একটা হিন্দুনাম নিতে হবে।

এই সময় বলে ওঠে ফজলুর, সেটাই তো মুশকিল। এঁর একটা হিন্দু নাম আছে—দিলীপ দে। দু'জন দিলীপ দের পক্ষে একসঙ্গে কাজ করার অসুবিধে অনেক।

—তাতে আর কি হয়েছে? বলতে বলতে আব্দুল থালা সমেত খাবারের ঠোঙাটা নিয়ে এসে তক্তপোষের এক কোণে রেখে নূরকে বললে, নিন ভাই, খেতে শুরু করুন।

মৃদু আপত্তি করে নূর, আমি আবার কেন? আপনারা খান। আমি স্টেশন থেকে নাস্তা সেরে এসেছি।

—তাতে কি হয়েছে? বলে ওঠে ফজলুর, আসুন সবাই মিলে খাওয়া যাক।

গরম সিঙ্গাড়ায় কামড় দিয়ে নূর ফজলুরকে আবার বললে, কিন্তু ঐ নামের ব্যাপারটা কী হবে, ভাইসাব?

জবাব দেয় আব্দুল, এ নিয়ে এত ভাবনার কী আছে? আপনার নামটা পাল্টে নিলেই চলবে।

—এতদিনের নামটা পাল্টাতে বলছেন?

—তাছাড়া আর উপায় কি বলুন? বলে ওঠে ফজলুর,

আমি শিলিগুড়িতে এই দিলীপ দে নামেই পরিচিত। আপনি সবে এসেছেন। পাল্টাতে হলে আপনার নামই পাল্টে অন্য একটা হিন্দু নাম রাখতে হবে।

নূর আর কিছু না বলে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে থাকলেও আব্দুল তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে এই নাম পাল্টানোর প্রস্তাবে সে খুশি নয়। তাই সে নূরকে জিজ্ঞেস করে, এই দিলীপ দে নামটা বুঝি আপনার খুব প্রিয়?

জবাব না দিয়ে নূর একটু ম্লান হাসে।

আব্দুল আবার বললে, বেশ, ঠিক আছে। আপনাকে নাম পাল্টাতে হবে না। ফজলুর আপনার চাইতে বয়সে বড়, তাই ওকে আমরা ডাকবো বড় দিলীপ বলে। আর আপনি হচ্ছেন ভাই ছোট দিলীপ। কেমন, এবার খুশি তো?

হেসে বললে নূর, হ্যাঁ, এই ভালো। আপনারা কেবল বয়সেই আমার চাইতে বড় নন, আপনারা হচ্ছেন পাকিস্তান মিলিটারীর অফিসার। আর আমি একজন সামান্য লোক। আপনারা ভাইসাব, আমাকে আর আপনি আজ্ঞে বলে কথা বলবেন না।

—বেশ—বেশ, তাই হবে। বলে ওঠে আব্দুল।

খেতে খেতে কাজের কথা বলতে থাকে তারা। পাকিস্তান গুপ্তচর বাহিনীর এই চক্রের কাজই হল পয়সার বিনিময়ে এদেশের সেনাবাহিনীর একদল বিভীষণ মারফত সৈন্যবাহিনীর জরুরী কাগজপত্র হাতিয়ে নিয়ে ওপারে পাচার করে দেয়া।

একসময় ফজলুর আব্দুলকে বললে, এখানে ছোট দিলীপের পরিচয় কি হবে?

আব্দুল জবাব দেবার আগেই বলে ওঠে নূর, কেন, আমি হচ্ছি আপনাদের শঙ্কর এ্যাণ্ড কোম্পানির পিওন। লেখাপড়া যখন জানি না, তখন এর চাইতে ভারি কাজে আমাকে মানাবে কেন?

ফজলুর ও আব্দুল কোন কথা না বলে নিঃশব্দে খেতে থাকে। নূর পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত মুছতে মুছতে বললে, আমি আর খাবো না। অনেক খেয়েছি।

—কিছুই তো খাওনি। আব্দুল বললে।

বলে ওঠে ফজলুর, ওর বোধহয় লজ্জা করছে।

-না না, ভাইসাব, লজ্জা-টজ্জা নয়। আর খেতে ইচ্ছে করছে না। কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ায় নূর। তারপর দেয়ালে ঝোলানো মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলালের ছবির দিকে তাকিয়ে বললে, ব্যবস্থা তো ভালই দেখছি।

ফজলুর ও আব্দুল খেতে খেতে কেবল মৃদু হাসে।

হঠাৎ দরজার মাথার ওপরে ঝোলানো মা দুর্গার ছবিখানার দিকে নজর পড়তেই বলে ওঠে নূর, একেবারে হিন্দুর বাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন যে, ভাইসাব!

জবাব দেয় ফজলুর, তাছাড়া আর উপায় কি? হিন্দু নাম নিয়ে যখন কাজ কারবার চালাচ্ছি তখন চাল-চলন, কথা-বার্তা আদব-কায়দায় হিন্দুর মত না হলে চলবে কেন?

মুখ টিপে হেসে আব্দুল বললে, ঘর থেকে বেরোবার সময় হিন্দুর ঐ দুর্গাঠাকুরণকে ঘটা করে প্রণাম পর্যন্ত করতে হয়। নইলে আমাদের হিন্দুত্ব সম্পর্কে লোকের বিশ্বাস হবে কেন? সবাইকে শুনিয়ে দুর্গানামও উচ্চারণ করতে হয়।

—মুসলমান হয়ে হিন্দুর দেবী দেবতাকে প্রণাম করলে তো গুণাহ হয়, ভাইসাব। নূর বললে।

—না, তা' হয় না, জবাব দেয় ফজলুর, পাকিস্তানের জন্যে কাজ করছি আমরা। গুপ্তচর বৃত্তিতে ভেক তো নিতেই হবে। এখানকার বারোয়ারী পূজোয় চাঁদা দিতে হবে, প্রসাদ খেতে হবে। গত বছর বারোয়ারী সরস্বতী পূজোয় আব্দুল তো মাঘ মাসের কড়া শীতে সকালে স্নান করে অঞ্জলি পর্যন্ত দিয়েছিল।

—সেকি? বিস্মিত কণ্ঠস্বর নূরের।

সলজ্জ কণ্ঠে আব্দুল বললে, হ্যাঁ দিয়েছিলাম। তবে পুরুত-ঠাকুর যখন জোরে জোরে সবাইকে মন্ত্র পড়াচ্ছিল তখন আমি এই গুনাহ থেকে মুক্তি পেতে মনে মনে আল্লাহতালার দোয়া প্রার্থনা করছিলাম।

নূর পায়ে পায়ে দরজার কাছে এসে একটু সময় তাকিয়ে থাকে মা দুর্গার ছবির দিকে। তারপর ফিরে এসে ফজলুর ও আব্দুলের পাশে বসতে বসতে বললে, জানেন ভাইসাব, হিন্দুর এই দুর্গাঠাকুরের সবই দেখতে শুনতে ভাল, কেবল ঐ হাম্বাবদন গণেশ ছাড়া। একে দেখলেই আমার হাসি পায়।

ফজলুর জিজ্ঞেস করে, গণেশের মুখং

তা, তুমি একে হাম্বাবদন বলছো কেন?

জবাব দেয় নূর, জানেন ভাইসাব, এটা আমার কথা নয়। পাকিস্তানের বাখরগঞ্জ জেলায় মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত একটা ছড়ায় গণেশকে হাম্বাবাদন বলা হয়েছে।

—কি রকম—কি রকম? কৌতূহলী হয়ে ওঠে ফজলুর।

হেসে বলতে থাকে নূর, শুনুন তবে ভাইসাব, একবার একটি মুসলনান ছেলে হিন্দুদের তুর্গাঠাকুর দেখে এসে তার চাচার কাছে ছড়ায় গণেশের বর্ণনা দিচ্ছিল—

এক ব্যাটার হাম্বা বদন,
কান তুইটা কুলার মতন,
দাঁত তুইটা মূলার মতন,
মাথা লেপা পোছা।
(একি) তুর্গা দেখলাম চাচা।

নূরের বলার ঢংয়ে হেসে ওঠে আব্দুল ও ফজলুর। আব্দুল হাসতে হাসতে বললে, বাঃ, চমৎকার বর্ণনা! তা, ছেলেটা কি কেবল তার চাচার কাছে গণেশের বর্ণনাই দিয়েছিল? খোদ তুর্গাঠাকুরের বর্ণনা দেয় নি?

জবাব দেয় নূর, হ্যাঁ, দিয়েছিল। তুর্গাঠাকুরণ হচ্ছে এই রকম—

এক বিটি সিংহের পরে,
অস্থরের টিকি ধরে,
গলায় দিছে সাপ জড়াইয়া,
বুকে মারছে খোঁচা।
(একি) তুর্গা দেখলাম চাচা।

নূর থামতেই মুখ টিপে হেসে ফজলুর বললে, আর ঐ লক্ষ্মী-সরস্বতী?

বলতে থাকে নূর—

তুই পাশে তুই হইলদা ছুঁড়ি,
রূপেতে বিদ্যাধরী,
পরনে ঢাকাই শাড়ি,
কাম করেছে হাচা।
(একি) তুর্গা দেখলাম চাচা।

হইলদা অর্থাৎ হলুদ গায়ের রঙ বিশিষ্টা ধন ও জ্ঞানের দুই দেবীর বর্ণনা শেষ করে নূর নিজেই আবার বললে, এর পরে বাকি থাকে একমাত্র কার্তিক। হিন্দুরা বলে এই দেবতা নাকি দেবতাদের সেনাপতি। তাই তার চেহারায়ও যেমন চটপটে ভাব, বসার কায়দাও একটু অন্যরকম—

ময়ূরের উপর বইছেন যিনি,
তার বড় চ্যাক্‌চ্যাকানি,
পায়ের উপর পা থুইয়া,
গুটি মারছে কোঁচা।
(একি) দুর্গী দেখলাম চাচা।

নূর থামতেই সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে। নূর আবার বললে, সে যাই হোক ভাইসাব, কোথাও বেরোতে হলে এই দুর্গাঠাকুরকে নিয়মমত প্রণাম করতে আমার কিন্তু ভুল হবে।

—কোন চিন্তা নেই, বলতে থাকে ফজলুর, আমরাই তোমাকে মনে করিয়ে দেব। সোজা কথায় এমনভাবে চলতে ফিরতে হবে যাতে আমাদের কেউ কোনরকম সন্দেহ করতে না পারে।

॥ ছয় ॥

ভারতীয় জওয়ানদের হাতে বারে বারে মার খেয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। ওদের ভাষায় ভারতের নাম হিন্দুস্তান। আর ভারতের মানুষ মাত্রই ওদের কাছে কাফের। সেই কাফেরদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। তাই বর্ডারের ওপারে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান মিলিটারী ইণ্টেলিজেন্সের বিরাট প্রস্তুতি। দিকে দিকে গুপ্তচর চক্রের সৃষ্টি। তারই একটা চক্রের অবস্থান এই শিলিগুড়িতে যার নায়ক পাকিস্তানী বাহিনীর লেফটেনাণ্ট আব্দুল করিম ওরফে স্বপন ও লেফ্‌টেনাণ্ট ফজলুর রহমান ওরফে বড় দিলীপ। আর সেই দলে যোগ দিয়ে দলকে

পুষ্ট করেছে নূর ইসলাম ওরফে ছোট দিলীপ।

পাকিস্তান সামরিক গুপ্তচর বাহিনীর দু'টি শাখা—একটির নাম '২০০ সার্ভে সেকশন' আর অন্যটি 'ফিল্ড ইণ্টেলিজেন্স'। এই গুপ্তচর বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য দুশমন ভারতবর্ষ। এই দেশটির ক্ষতি করাই তাদের একমাত্র পবিত্র কর্তব্য। ফিল্ড ইণ্টেলিজেন্সের গুপ্তচর বাহিনীর কর্মক্ষেত্র পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চল ও সেই অঞ্চল থেকে ভারত ভূখণ্ডের পাঁচ মাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অঞ্চলের ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর যাবতীয় গোপন খবর সংগ্রহ করাই তাদের একমাত্র কাজ। সেই খবরের ভিত্তিতেই পাকিস্তান স্থির করে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, তৈরি করে বাঙ্কার ও পিল বক্স, সমাবেশ ঘটায় বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের।

সার্ভে সেকশনের কর্মক্ষেত্র কিন্তু গোটা ভারতবর্ষে বিস্তৃত। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রতিরক্ষা ইউনিটের খবর জোগাড় করতে সর্বদাই সচেষ্ট এই সেকশনের গুপ্তচর বাহিনী। এই জন্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে তারা। আর এই অর্থের লোভে ভারতবর্ষের একদল দেশদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতক সর্বদাই সহযোগিতা করে তাদের সঙ্গে। এরা দেশের স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে বেড়ায়।

সার্ভে সেকশনের হেড-কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায়। এই সেকশনটি পরিচালনা করে পাক সামরিক বাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার। এর অধীনে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে তোলা হয়েছে পাঁচটি শাখা যথা, দিনাজপুর, যশোর, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট ও কক্সবাজার। এই পাঁচটি শাখা পরিচালনা করে একজন করে মেজর। দিনাজপুরের শাখাটির পরিচালক মেজর লতিফ। আর, এই লতিফ সাহেবের ব্যবস্থাপনাতেই গড়ে উঠেছে সীমান্তের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ড শিলিগুড়িতে পাকিস্তানের সেই গুপ্তচরচক্র।

গুপ্তচর বাহিনী নিজের দেশে সংবাদ পাচার করে 'কোড' শব্দের মাধ্যমে যাতে অন্য কেউ চট্ করে তার অর্থ বুঝতে না পারে। মিলিটারীর গোপন দলিলপত্রের নাম 'মাল', ভারতের সেই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক যারা পয়সার বিনিময়ে এই গুপ্তচর বাহিনীকে সংবাদ কিম্বা সেই গোপন দলিলপত্র সরবরাহ করে তাদের কোড নাম 'বন্ধু'। ভারতের একদল লোভী মানুষকে

নিজের দলে টেনে এনে তাদের দেশদ্রোহী বানানোর কাজকে বলা হয় 'হাত করা'।

এছাড়া, ভারতীয় মিলিটারী সংক্রান্ত অনেক কোড নামও রয়েছে তাদের সেই গোপন অভিধানে। ভারতীয় 'ন্যাট' বিমানের নাম 'নেট', ভারতীয় ট্যাঙ্ক 'বৈজয়ন্তর' নাম 'বজুতি', ব্যারাকপুর হেড কোয়ার্টারের মাউন্টেন ব্রিগেড হচ্ছে '৩২ মো', ব্যারাকপুরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৬ নম্বর ইউনিটের নাম 'এ-আর-৬', ব্যারাকপুরের বিমান বাহিনীর ২০ নম্বর সিগন্যাল রেজিমেণ্ট হচ্ছে 'সি—২০'।

পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি অন্যতম ঘাঁটি হচ্ছে কলাইকুণ্ডায়। 'ক—২'-এর অর্থ ঐ কলাইকুণ্ডার বিমান বাহিনীর ২নম্বর ইউনিট। ব্যারাকপুরের আমবাগানে বিমান বাহিনীর ৫ নম্বর ইউনিটের নাম 'আম ৫', '৭ তারিখ × রাজপুত'-এর অর্থ ব্যারাকপুরের রাজপুত রেজিমেণ্টের একটি ইউনিট ৭ তারিখে মুভমেণ্ট শুরু করেছে, 'ফুল ৩৪১১' হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের খুলনার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ফোন নম্বর।

এমনি ধরনের শত শত শব্দ রয়েছে পাক গুপ্তচরদের ঝুলিতে যা তারা সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে ভারতীয় বাহিনীর অসাধারণ ক্ষতি করে। এদের পরনে ভারতীয় পোশাক, মুখে ভারতীয় বুলি, আচার আচরণে অবিকল ভারতীয়। এমনকি অন্যের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে হিন্দুর ধর্মীয় আচরণ পর্যন্ত এরা অনুসরণ করে থাকে অনায়াসে। অন্যের চোখে ধুলো দিতে এদের আচরণে বাইবেলের নির্দেশ, মননে কোরানের সুরা আর কথনে গীতার শ্লোক। সার্থক বহুরূপী এরা, তাই এরা সার্থক গুপ্তচর।

বড় দিলীপ, স্বপন ও ছোট দিলীপ। প্রথম দু'জন মেকি রিপ্রেজেণ্টেটিভ, আর তৃতীয়জন তাদের মেকি পিওন। বজরংবলী বরফওয়ালার ভাড়া বাড়ির একই ঘরে থাকে তারা। ছোট দিলীপ আসার পর থেকে সে-ই এই পরিবারের রান্নাবান্নার ব্যাপারটা তুলে নিয়েছিল নিজের কাঁধে।

রাত প্রায় আটটা। রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল ছোট দিলীপ। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সে দরজা খুলে দেয়। বাইরে দাঁড়িয়ে মনোরঞ্জন।

জিজ্ঞেস করে মনোরঞ্জন, স্বপনবাবু বাড়ি আছে ?

ছোট দিলীপ জবাব দেয়, না, একটু আগে বেরিয়েছে। এখনই ফিরবে। আপনি এলে অপেক্ষা করতে বলে গেছে।

মনোরঞ্জন নিজের মাথার ছোট্ট টাকের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে কি যেন একটু ভাবে। তারপর ঘরে ঢুকে তক্তপোষের এককোণে বসে আগের দিনের পুরানো খবরের কাগজখানা টেনে নেয় নিজের কাছে।

মনোরঞ্জন সরকার ব্যাংডুবির মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসের পিওন। সপরিবারে থাকে শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগরে একটা ভাড়া বাড়িতে। মাস কয়েক হল বড় দিলীপ ও স্বপনের সঙ্গে তার পরিচয় হলেও স্বপনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা একটু বেশি। মিলিটারী অফিসের পিওন হলেও লেখাপড়া মোটামুটি জানে। ডিউটির সময় পরতেও হয় মিলিটারী পোশাক। অফিসের জরুরী কাগজপত্র তার মত পিওনদের হাত দিয়েই চলাচল করে এক অফিসারের কাছ থেকে অন্য অফিসারের টেবিলে। ফাইলপত্র আলমারীতে ওঠাতে নামাতেও হয় তাকেই। কাজেই জরুরী কাগজপত্র পাচার করার সুযোগও তার যথেষ্ট।

একটু পরে স্বপন এসে হাজির হতেই মনোরঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললে, এই যে এসে গেছেন। আমি সেই কখন থেকে তীর্থের কাকের মত বসে আছি আপনার অপেক্ষায়।

স্বপনও গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে হেসে জবাব দেয়, তীর্থের কাকই হোন আর যা-ই হোন না কেন, কোন ভাল খবর আনতে পেরেছেন কি ? নাকি সেই একই খবর—কিছুতেই জোগাড় করা যাচ্ছে না।

মুখ টিপে হেসে মনোরঞ্জন আবার বললে, যদি বলি সেই একই খবর ?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় স্বপন, তা, আপনিই জানেন। তবে আপনার মুখ চোখ বলছে যে তা নয়। কিছু ভাল খবর বোধহয় আজ এনেছেন।

এবার একটু জোরেই হেসে ওঠে মনোরঞ্জন। তারপর বললে ঠিক ধরেছেন। ভাল খবরই আছে আজ।

উৎফুল্ল কণ্ঠে স্বপন আবার বললে, সত্যি বলছেন ? সেই

ম্যাপটা জোগাড় করতে পেরেছেন ?

এবার বেশ ভারিক্কি চালে জবাব দেয় মনোরঞ্জন, শুধু কি তাই, ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের জেনারেলের একটা গোপন সার্কুলারের কপি পর্যন্ত আপনার জন্যে এনেছি।

—কই—কই, দেখি। গায়ের জামা খোলার আর অবসর হয় না স্বপনের। মনোরঞ্জনের গা-ঘেঁসে বসে পড়ে। বললে, বের করুন আগে। চোখ দু'টো তার চকচকে করে ওঠে।

মনোরঞ্জন তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা ম্যাপের ব্লু-প্রিণ্ট ও টাইপ করা একখানা কাগজ বের করে তুলে দেয় স্বপনের হাতে।

কাগজপত্রের ভাঁজ খুলে তার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্বপন। বহু প্রতীক্ষিত এই ম্যাপটা। সেই সঙ্গে ফাউ হিসেবে এই গোপন সার্কুলার।

হঠাৎ স্বপন মনোরঞ্জনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চাপা উত্তেজনায় বলে ওঠে, কামাল করেছেন—আপনি কামাল করেছেন, দাদা। আপনার কাজের আর জবাব নেই।

মনোরঞ্জন পা নাচাতে নাচাতে কেবল একটু তৃপ্তির হাসি হাসে। তারপর এক সময় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, যাক, বলুন এবার খুশি হয়েছেন তো ?

—নিশ্চয়। দারুণ খুশি হয়েছি।

—তাহলে এবার আমাকেও কিন্তু ভালোমত খুশি করতে হবে।

—আলবৎ। আপনাকে খুশি না করলে আমার জন্যে ভবিষ্যতে আপনি এমন ঝুঁকি নেবেন কেন ?

কথাটা শেষ করেই স্বপন ঘরের একমাত্র টেবিলের কাছে সরে গিয়ে ড্রয়ার খুলে কতগুলো একশো টাকার নোট নিয়ে এসে গুঁজে দেয় মনোরঞ্জনের হাতে।

মনোরঞ্জন খানিকটা বিহ্বল। স্বপনের সঙ্গে বেশ কিছুকাল ধরে সে এই কাজ কারবার চালাচ্ছে। একশো-দেড়শোর বেশি সে কোনদিন পায় নি। এবারের সাফল্য অনেক বেশি বলে দুশো-আড়াইশো, বড়জোর তিনশোর বেশি কিছুতেই পাবে না বলে সে ধরে রেখেছিল। সেখানে, স্বপন তার হাতে পাঁচখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দেয়াতেই তার এই বিহ্বলতা।

স্বপন হেসে বললে, কি, খুশি হয়েছেন তো, দাদা ?

টাকাগুলো ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে মনোরঞ্জন নিঃশব্দ হাসিতে সারা মুখ ভরিয়ে তুলে মাথা নেড়ে জবাব দেয়, হ্যাঁ, খুব খুশি।

দামী 'মাল' হাতে এসেছে। কাজেই যত তাড়াতড়ি সম্ভব এগুলো দিনাজপুরের 'মামার' হাতে পৌঁছে দিতে হবে। দেরি করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

সেদিন রাতেই খেতে বসে বড় দিলীপের কাছে কথাটা পাড়লে স্বপন বললে, শোন ফজলুর, কাল সকালেই নুরকে একবার পাঠাতে চাই দিনাজপুরে।

—'মাল' পেয়েছ নাকি ? খেতে খেতে জিজ্ঞেস করে বড দিলীপ।

মাথা নেড়ে সায় দেয় স্বপন।

—কে, মনোরঞ্জন ?

এবারেও মাথা নেড়ে সায় দেয় স্বপন।

বড় দিলীপ আর কিছু না বলে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধরে খেয়ে যেতে থাকে। তারপর একসময় মাথা তুলে স্বপনের দিকে তাকিয়ে সামান্য ম্লান কণ্ঠে বললে, জানো আব্দুল, 'মামা' বোধহয় ওদিকে আমার ওপর খাপ্পা হয়ে উঠেছে।

খাওয়া থামিয়ে বড় দিলীপের মুখের দিকে তাকায় স্বপন। তারপর জিজ্ঞেস করে, কেন ?

—বারে, হবে না ? তোমার মনোরঞ্জন কি চমৎকার কাজ করে চলেছে। নিয়মিত মালপত্র এনে তোমাকে দিচ্ছে। তুমিও তা পাঠিয়ে দিচ্ছ দিনাজপুর। কিন্তু আমার অবস্থা একবার ভাবো আমার ব্যাংডুবির সেই দোস্তটি কিছুতেই আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে মালপত্র আমার হাতে পৌঁছে দিতে পারছে না। কাজেই ওপারে বসে 'মামা' হয়তো ভাবছে আমি এখানে বসে কোন কাজই করছি না।

বড় দিলীপের ব্যাংডুবির দোস্তটির নাম প্রসন্নকুমার দাস। বছর বাইশের মত বয়স। গায়ের রং ময়লা হলেও দেখতে শুনতে মন্দ নয়। পেটানো মজবুত শরীর। ব্যাংডুবির ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসে মনোবঞ্জনেব সঙ্গেই কাজ করে। বিয়ে-থা করেনি। তাই শিলিগুড়িতে আলাদা বাসা ভাড়া না করে সেখানকার মেসেই থাকে।

এই প্রসন্ন দাস হচ্ছে বড় দিলীপের কাছের মানুষ অর্থাৎ 'সোর্স'। এর মাধ্যমে বড় দিলীপ কিছু কিছু মালপত্র জোগাড় করেছিল। কিন্তু ইদানীং মাসখানেক ধরে সে কিছুই দিতে পারছে না। বড় দিলীপ জিজ্ঞেস করলে ম্লান কণ্ঠে প্রসন্ন জবাব দেয়, বড়ই কড়াকড়ি দাদা, কিছুতেই সুযোগ পাচ্ছি না। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, পেলেই নিয়ে আসবো আপনার কাছে।

গুপ্তচরদের মধ্যেও রেষারেষি—প্রতিযোগিতা। একজন খবরা-খবর কিংবা মালপত্র জোগাড় করছে, আর একজন পারছে না। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে মানসিক সংঘাত গুপ্তচরবৃত্তির মধ্যেও ঘটে থাকে।

বড় দিলীপের মনের ভাব বুঝতে অসুবিধে হয় না স্বপনের। তাই সে জিজ্ঞেস করে, বেশ তো, তোমার প্রসন্ন না হয় পারছে না, কিন্তু তোমার সিং সাহেব?

সিং সাহেব মানে কে, পি, সিং। এই লোকটিও মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসের মানুষ। বেশ বয়স হয়েছে। মাথার চুলের ঘাটতি পূরণ করেছে মোটা গোঁফজোড়া দিয়ে। বিহার না উত্তরপ্রদেশের লোক। এই বয়সেও দেশের স্বার্থ বিকিয়ে বাড়তি পয়সা রোজগারে অনীহা নেই। লোকটিও বড় দিলীপকে কিছু কিছু মালপত্র দিয়েছিল।

কে, পি, সিংয়ের কথায় জবাব দেয় বড় দিলীপ, এই লোকটি তো আরও সরেস। মাস দুয়েক আগে কিছু 'মাল' দিয়ে সেই যে চুপ করে আছে আর নড়াচড়া করছে না। জিজ্ঞেস করলেই বলে, জী হাঁ, কোসিস কর্ রহা হ্যায়। মিল্‌নে সে দে দুংগা। কিন্তু কবে যে দেবে আল্লাহ্‌তালাই জানেন। কথাটা শেষ করে বড় দিলীপ খাওয়া শেষে ঢক্‌ঢক্ করে জল খেয়ে উঠে পড়ে।

নূর ইসলাম অর্থাৎ ছোট দিলীপের এই হিন্দুয়ানী ঠিক পছন্দ নয়। বোধহয় তার মা হিন্দু ছিল বলেই তার এই মনোভাব। সে নিজে যে ঠিক গোঁড়া মুসলমান তা নয়। পূর্ব-পাকিস্তানে থাকতেও সে কোনদিন নামাজও পড়তো না কিম্বা মস্‌জিদেও যেত না। কিন্তু তাই বলে নিজেকে একজন খাঁটি মুসলমান ভাবতে সে কোনরকম দ্বিধা বোধ করত না। সোজা যুক্তি তার—নাই বা পড়লাম নামাজ, নাই বা গেলাম মসজিদে, কিন্তু জামিব

মিঞার ছেলে আমি। কাজেই আমি খাঁটি মুসলমান। এই জন্যেই শিলিগুড়িতে তার হিন্দুর আচার আচরণ বরদাস্ত হত না। কিন্তু উপায় নেই, নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখতে যদিও এটা একটা চমৎকার পন্থা, কিন্তু নূর ইসলাম ছোটবেলায় তেমন শিক্ষাদীক্ষা পায় নি বলেই হয়তো নিজের মুসলমানত্ব সম্পর্কে সে একটু বেশি সচেতন।

বড় দিলীপ কিম্বা স্বপনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। তারা পাক মিলিটারীর অফিসার, শিক্ষিত। নিজেদের খাঁটি মুসলমান ভাবলেও প্রয়োজনে হিন্দুয়ানীতে অস্বস্তিবোধ করতো না তারা। তাদের মতে, গুপ্তচরের কাজে এ ধরনের ভেক তো নিতেই হবে।

শিলিগুড়ির গুপ্তচর চক্রের কুরিয়ার অর্থাৎ দূত এই ছোট দিলীপ। স্বপনের দেয়া সেই 'মাল' নিয়ে সে পরের দিনই রওনা হয় দিনাজপুরের উদ্দেশে। বর্ডার পার হওয়া কোন সমস্যাই নয়। বুড়িমারি—চ্যাংড়াবাঁধা পথে দালালের অভাব নেই। এদের মধ্যে সৈয়দ আলী মোল্লার খুব নাম-ডাক। ভারতীয় ভূখণ্ডের অধিবাসী সে। টাকা পয়সার বিনিময়ে ভারতীয় টহলদার বাহিনীর চোখে ধুলো দেবার কায়দা-কানুন তার নখদর্পণে। বিশেষ করে, ওপারের গুপ্তচর বাহিনীর লোকজনকে মদত দেয়ার মত কাজকে সে একটা পুণ্যকর্ম বলেই মনে করে। এ কাজে সময় সময় সে তাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিকও গ্রহণ করে না।

সৈয়দ আলী মোল্লার সাহায্যে ছোট দিলীপ অনায়াসেই সীমান্ত পার হয়। অবশেষে দিনাজপুর পৌঁছে সে সোজা চলে যায় 'মামা'র কাছে।

'মামা' অর্থাৎ মেজর লতিফ 'মাল' দেখে তো মহাখুশি। ছোট দিলীপের পিঠ চাপড়ে বলে ওঠে, সাবাস! ফিরে গিয়ে আব্দুলকে বলো যে আমি খুব খুশি হয়েছি। ম্যাপ্ ও কাগজটা আমাদের খুব কাজে লাগবে।

মামার প্রশংসায় ছোট দিলীপের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে তৃপ্তির চিহ্ন। কি একটা কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে সে চুপ করে থাকে।

দিলীপের ভাব-ভঙ্গী দেখে লতিফ জিজ্ঞেস করে, কিছু বলবে?

ছোট দিলীপ বললে, কিছু পয়সা-কড়ি—।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, হাজার দুয়েকের মত টাকা তোমাকে দেব।

মেজর লতিফকে সেলাম জানিয়ে খুশি মনে ছোট দিলীপ চলে আসে বাইরে। মনে মনে বলে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

॥ সাত ॥

প্রেম। তাও আবার এক মোটামুটি সুন্দরী হিন্দু যুবতীর সঙ্গে। এমন সুযোগ ছেড়ে দেবার মত বোকা ফজলুর ওরফে বড় দিলীপ নয়। অনুর চোখেও প্রেমের নেশা। বাস্তবিকই সুপুরুষ তার দিলীপদা। দিনে অন্ততঃ একটিবার দিলীপদা তাদের খোঁজ খবর নিতে আসবেই।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দিকে দিলীপ মাছ কিম্বা মাংস নিয়ে এসে হাজির হয় অনুদের বাড়ি। অনু কিছু না বললেও মুখরা শেফালি মুখ টিপে হেসে কৈফিয়ত তলবের সুরে জিজ্ঞেস করে, কি মশাই, রোজ রোজ এসব নিয়ে আসেন কেন, শুনি?

—রোজ রোজ আর আনছি কোথায়? জবাব দেয় বড় দিলীপ।

শেফালী আবার বললে, আর বেছে বেছে সোমবারেই আপনি এসব আনেন।

—সোমবার? তা হবে হয়তো।

—না মশাই, হয়তো নয়। ঠিকই তাই। গত সোমবারের আগের সোমবারই তো মাংস এনেছিলেন।

—তাই নাকি? বলতে থাকে বড় দিলীপ, তা সোমবার তোমাদের মাছ মাংস খেতে আপত্তি আছে নাকি?

—না—না, আমাদের আপত্তি থাকবে কেন? আমরা তো ভালই খাই। তবে পরিশ্রম করে যে রান্না করে তার আর খাওয়া হয় না।

—কে রান্না করে? অজ্ঞতার ভান করে বড় দিলীপ।

মুখ টিপে হেসে শেফালি বললে, আহা, যেন কিছুই জানেন না আপনি। এ বাড়িতে দিদির চাইতে ভাল আর কে রান্না করতে পারে?

—কেন তুমি পারো না? হেসে জিজ্ঞেস করে বড় দিলীপ।

—দিদির সঙ্গে আমার তুলনা? চোখ দুটো বড় করে বলতে থাকে শেফালি, আর পারলেও রাঁধতাম না।

—কেন?

—আপনি তো আর আমার হাতের রান্না খাওয়ার জন্যে এসব আনেন না। যার জন্যে আনেন সেই তো রাঁধে।

শেফালির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে মনে মনে একটু লজ্জিত হয় বড় দিলীপ। একটু সময় চুপ করে থেকে সে আবার জিজ্ঞেস করে, তা না হয় হলো। কিন্তু তোমার দিদি এসব খায় না কেন?

কৃত্রিম নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দেয় শেফালি, এর জবাব আমার কাছ থেকে না নিয়ে দিদির কাছ থেকে নিলেই তো পারেন। কথাটা শেষ করে শেফালি ফিক্ করে একটু হেসে সরে পড়ে সেখান থেকে।

বয়সে বড় বলে এ বাড়ির গার্জেন অনু। ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনার ভার তারই ওপর। তবে ওদের এক বিধবা পিসিমাও থাকেন এই সংসারে। বয়স প্রায় সত্তরের কোঠায়। এঁর ওপর ভরসা করেই অনুদের বাবা মা থাকেন নেফায়। তবে যাঁর ওপর ভরসা করা সেই বৃদ্ধা পিসিমাকেই ভরসা করে থাকতে হয় নিজের এই ভাইপো ভাইঝিদের ওপর। ইনি নির্বিরোধী মানুষ। নিজের পুজো-আচ্চা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন দিনের অধিকাংশ সময়। একালের ছেলে মেয়েদের চাল চলন তাঁর ঠিক ভালো লাগে না। কিন্তু তাই বলে এ নিয়ে কিছু বলেনও না। কেবল কোন কারণে একটু বেশি বিরক্তি বোধ করলে বলেন—কালই আমি নেফায় চিঠি লিখছি।

খিল খিল করে হেসে উঠে শেফালি হয়তো বলে, তুমি নিজে তো লিখতে জানো না, পিসিমা। চিঠি লিখতে হলে তো আমাদের দিয়েই লেখাতে হবে।

এবার ছোট বোনকে ধমকে ওঠে অনু, ওকি হচ্ছে শেফালি? পিসিমার পেছনে লাগছিস্ কেন?

এবাড়িতে বড় দিলীপের যাতায়াতের আসল কারণটি যে কী, তা না বোঝার মত বোকা নন পিসিমা। বৃদ্ধা হলেও তিনি সবই বোঝেন। মনে মনে হয়তো বলেন, মন্দ কি? ছেলেটি তো দেখতে শুনতে মন্দ নয়।

একদিন সুযোগ পেয়ে অনুকে একান্তে জিজ্ঞেস করে বড় দিলীপ, তুমি নাকি আমার আনা মাছ মাংস খাও না?

—খাবো না কেন? তবে সোমবার আমার উপোস। সলজ্জ কণ্ঠে অনু বললে।

জিজ্ঞেস করে বড় দিলীপ, সোমবার আবার কিসের উপোস?

এবার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে অনু, সোমবার কোন দেবতার নামে উপোস করতে হয় জানো না?

বড় দিলীপ মাথা নাড়ে। কণ্ঠে বিস্ময় ফুটিয়ে বলে ওঠে অনু, হিন্দু হয়ে জানো না সোমবার কার নামে উপোস করা হয়?

বুকটা ধক করে ওঠে বড় দিলীপের। হিন্দুই বটে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, সপ্তাহে দিন তো কেবল সাতটা। আর দেব দেবতার সংখ্যা তো অগুণতি। এদের মধ্যে কোনদিন যে কার জন্যে নির্দিষ্ট সে খবর সত্যিই আমি রাখি না।

অনু বললে, সোমবারের উপোস শিবের নামে।

তাড়াতাড়ি বলে ওঠে বড় দিলীপ, হ্যাঁ—হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। সোমবারের উপোস শিবের নামে, মঙ্গলবার মঙ্গলচণ্ডীর নামে, বুধবার—

—থাক—থাক, হয়েছে, সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলতে থাকে অনু, আর পাণ্ডিত্য জাহির করতে হবে না।

বড় দিলীপ আবার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা কুমারী মেয়েরা শিবঠাকুরের এত ভক্ত কেন?

—জানি না, বলে সলজ্জ ভঙ্গিতে সেখান থেকে পালাতে চেষ্টা করতেই বড় দিলীপ অনুর হাতখানা টেনে ধরে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বললে, জবাব না দিলে যেতে দেব না।

—ছাড়ো ছাড়ো, চাপা সুরে বলে ওঠে অনু।

অনুকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনে বড় দিলীপ বললে, আগে জবাব দাও, তারপর ছাড়বো।

অনু কিন্তু এবার আর পালাতে চেষ্টা করে না। নিজের

লজ্জারক্তিম মুখখানি বড় দিলীপের দিকে তুলে ধরে অপলক চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, শিবের মত বর পাবে বলে।

কথাটা শেষ করেই অনু নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করতেই বড় দিলীপ তাকে টেনে আনে নিজের বুকের ওপর। তারপর তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসার চিহ্ন এঁকে দিতে থাকে তার ঠোঁটে মুখে কপালে।

বড় দিলীপের কাছে এরকম আদর অনুর নতুন নয়। এর আগেও এই ধরনের আদর সে পেয়েছে তার কাছে। কিন্তু আজকের আদরের প্রকৃতি যেন একটু ভিন্ন। নারীর স্বাভাবিক বুদ্ধি বলে সে টের পায় এক ভয়ঙ্কর ঝড়ের পূর্বাভাস। শঙ্কিত হয়ে ওঠে তার নারী মন। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাড়নায় সে ফিস ফিস করে বলতে থাকে, ছাড়ো—ছাড়ো দিলীপদা, পিসিমা এসে পড়বে।

উত্তেজিত বড় দিলীপ অনুকে তেমনি নিজের বুকের ওপর চেপে রেখে চাপা কণ্ঠে বলে ওঠে, না, পিসিমা আসবে না।

অনু বুঝতে পারে আজ আর তার রেহাই নেই। তবুও শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে সে চাপা কণ্ঠে বলে ওঠে, না—না, দিলীপদা—

অনু যতই কেন না 'না—না' করুক সেই মুহূর্তে এমন একটা মস্ত সুযোগ ছেড়ে দেবার মত বোকা বড় দিলীপ নয়। কাজেই সে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে অনুকে। আর অনুর নরম দেহটা কেঁপে ওঠে থরথর করে। ভারি হয়ে ওঠে তার চোখের পাতা।

ঝড়ের পরে প্রকৃতি শান্ত। বড় দিলীপ চলে গেছে। অনু কিন্তু সেই ঝড়ের প্রথম অভিজ্ঞতা বুকে নিয়ে প্রায় শূন্য মনে তখনও সেই তক্তপোষের ওপর শুয়ে।

এর পরে আরও কয়েকদিন অনুর এমনি অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে বড় দিলীপের কাছ থেকে। প্রতিবারই পূর্বপাকিস্তানের গুপ্তচর ফজলুর রহমান বিয়ের আশ্বাস দিয়েছে একটি সরল যুবতী অনুভা সাহাকে।

অবশেষে একদিন অনু সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলে যে তার নিজের দেহের মধ্যে জেগে উঠেছে আর একটি জীবনের স্পন্দন।

মাথাটা ঘুরে উঠলো তার। এমন আশঙ্কা তার বরাবরই ছিল। এমনকি তার এই আশঙ্কার কথা আকারে ইঙ্গিতে বড় দিলীপের কাছে ব্যক্তও করেছিল সে। কিন্তু বড় দিলীপের সেই একই আশ্বাসবাণী—ভয় কি? আমি তো আছি।

কথাটা একদিন বড় দিলীপকে বলতেই খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলো সে। শঙ্কিত কণ্ঠে বলে ওঠে অনু, ওকি চুপ করে রইলে কেন? কিছু বলো।

মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় বড় দিলীপ, কী আর বলবো?

অনুর কণ্ঠে এবার স্পষ্ট বিরক্তি। বলে ওঠে সে, কিছুই বলার নেই তোমার?

অনুর কণ্ঠস্বরের সেই বিরক্তি কিন্তু কান এড়ায় না বড় দিলীপের। তাড়াতাড়ি সে জবাব দেয়, না না, বলার কিছু থাকবে না কেন?

—তাহলে এবার বলো আমি এখন কি করবো?

—কী আর করবে? যেমন আছো তেমনি থাকবে।

—তারপর?

—তারপর একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।

একটু থেমে বড় দিলীপ আবার বললে, আচ্ছা অনু, তোমার কি মনে হয় তোমার জন্যে আমার কোন চিন্তা নেই?

দিলীপের কথার ধরনে অনুর মনের শঙ্কা আরও বেড়ে ওঠে। কিন্তু বড় দিলীপকে তা টের পেতে না দিয়ে একটু চড়া সুরে সে বললে, হ্যাঁ, আছে বৈকি। কেবল যা নেই তা' বোধহয় তোমার বিয়ে করার ইচ্ছে, কেমন?

—না—না, বলতে থাকে বড় দিলীপ, কথার খেলাপ হবে না আমার। বিয়ে তোমাকে করবো-ই। তবে—

—তবে কি? তেমনি চড়া সুরের প্রশ্ন অনুর।

—তবে, দমদমে মা-বাবা আছেন। তাদের একটা অনুমতি তো অন্ততঃ নিতে হবে।

সহসা মনের কৃত্রিম কাঠিন্য. কর্পূরের মত উবে যায় অনুর। সেটুকু সরে যেতেই তরল জলের ধারা অশ্রু হয়ে বেরিয়ে আসতে থকে তার দু'চোখের কোল বেয়ে। সে বলতে থাকে, তুমি আমাকে বাঁচাও, দিলীপদা।

অন্নুর চোখের জলে সেই মুহূর্তে বিব্রত বোধ না করে পারে না বড় দিলীপ। প্রেমের অভিনয় করলেও এই মেয়েটার ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়েছিল তার। দমদমে মা-বাবার অনুমতি নেয়ার কাল্পনিক কাহিনী সে তৈরী করেছিল কিছুটা সময় হাতে পাবে বলে।

অন্নু তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বললে, তোমার মা-বাবা যদি অনুমতি না দেন ?

আশ্বাস দিতে গিয়ে অন্নুর পিঠে হাত রেখে জবাব দেয় বড় দিলীপ, তাঁদের অনুমতি যে করেই হোক আমি আদায় করবো। তুমি কিছু ভেবো না।

অন্নু পরম নিশ্চিন্তে বড় দিলীপের কাঁধে মাথা রেখে চুপ করে থাকে। এই মুহূর্তে এই লোকটিকে বিশ্বাস করতে ভাল লাগে তার।

॥ আট ॥

ইদানীং বেশ কিছুদিন মালপত্র আসছে না শিলিগুড়ির এই পাকিস্তানী গুপ্তচরদের হাতে। শংকিত হয়ে ওঠে স্বপন ও বড় দিলীপ। তবে কি এখানকার সেনাবাহিনী ব্যাপারটা টের পেয়েছে ? তা যদি হয় তো সমূহ বিপদ।

কথাটা স্বপন একদিন মনোরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করতেই মনোরঞ্জন মৃদু হেসে হালকা সুরে বললে, আরে না—না, সেসব কিছু নয়। আমাদের কাজ এত কাঁচা নয় যে ধরা পড়বো। আসলে কিছু-দিন ধরে কোন সুযোগই পাচ্ছি না।

মনোরঞ্জন থামতেই বড় দিলীপ জিজ্ঞেস করে, আপনি না হয় সুযোগ পাচ্ছেন না, কিন্তু আমাদের প্রসন্ন কিংবা সিং সাহেবেরও কি একই অবস্থা ? ওদের সুযোগও কি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ?

—ওদের কথা বলতে পারবো না, মাথা চুলকে জবাব দেয়

মনোরঞ্জন, ব্যাংডুবির একই অফিসে অবশ্যি আমরা আছি, কিন্তু কাজ করি ভিন্ন সেক্শনে।

মনোরঞ্জন, প্রসন্ন ও কে. পি. সিং ওরফে কৃষ্ণপ্রসাদ সিং—ব্যাংডুবির মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের এই ত্রিরত্ন অর্থের লোভে একে অন্যের ওপর টেক্কা দিতে সর্বদাই সচেষ্ট। কে কাকে ডিঙিয়ে ভাল 'মাল' পাচার করে মোটা টাকা হাতাবে সেই চিন্তাতেই তাদের দিন কাটে। চমৎকার রোজগারের পথ! দিনের শেষে অফিস থেকে বেরোবার মুখে ভাল 'মাল' সঙ্গে করে নিয়ে এসো। তারপর সুযোগমত গোপনে তা পৌঁছে দাও বড় দিলীপ ও স্বপনের হাতে। বিনিময়ে মোটা টাকা পকেটস্থ করে বাড়ি ফিরে যাও। এমন ফালতু পয়সার সবটা বাড়ি নিয়ে না গেলেও চলে। একটা অংশ শিলিগুড়ি সহরের এখানে ওখানে গজিয়ে ওঠা আড্ডায় সিকিমের লেবেল-আঁটা বোতলের পেছনে খরচ করলেও বা ক্ষতি কি?

একদিন বড় দিলীপের ডাক এলো প্রসন্ন ও সিং সাহেবের কাছ থেকে। এ ডাকের অর্থ বড় দিলীপ জানে। প্রসন্ন ও কে. পি. সিং মনোরঞ্জনের চাইতে বেশি সতর্ক। মনোরঞ্জনের মত মাল পৌঁছে দিতে তারা বড় দিলীপ ও স্বপনের ডেরায় যায় না। তার বদলে তারা বড় দিলীপকে ডেকে পাঠায় তাদের নির্দিষ্ট একটা চা দোকানে। সেখানে ঘটে লেন-দেন।

ডাক শুনে বড় দিলীপ খুব খুশি। বললে, যাক, এতদিনে বোধহয় প্রসন্ন ও সিং সাহেব আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

কথাটা কানে যেতেই স্বপন একটু ম্লান হেসে বড় দিলীপকে বললে, সেদিন দিনাজপুরে গিয়ে মামার কথাবার্তায় মনে হল আমার মনোরঞ্জন আর তোমার প্রসন্ন ও কে. পি. সিং-এর ওপর নির্ভর করে থাকতে তিনি আর রাজি নন।

—তিনি তবে কি চান? জিজ্ঞেস করে বড় দিলীপ।

জবাব দেয় স্বপন, তিনি চান আমরা নতুন নতুন এজেন্ট তৈরী করে তাদের দিয়ে কাজ করাই। তিনি সে দিন স্পষ্টই বললেন, একাজে একই লোকের ওপর বেশিদিন ভরসা করে থাকতে নেই।

বড় দিলীপ একটু বিরক্তির সুরে বললে, তা, এমন আর

নতুন কি কথা শোনালেন তিনি? এসব কি আমাদের অজানা? কিন্তু নতুন এজেন্ট তৈরী করা কি চাট্টিখানি কথা? বিদেশী রাষ্ট্রের বুকের ওপর বসে একাজে রিস্কও যেমন যথেষ্ট তেমনি কাউন্টার-এস্‌পিওনেজের ভয়ও প্রচুর। সাবধানে না এগোলে নির্ঘাৎ ভরাডুবি।

বড় দিলীপ থামতেই স্বপন বলে ওঠে, যা বলেছো। কিন্তু কর্তারা ওপারে নিশ্চিন্তে বসে এসব শুনতে চান না। তারা চান বেশি বেশি কাজ। ইণ্ডিয়ান মিলিটারীর যাবতীয় খবরাখবর সন্থ সন্থ তারা হাতে পেতে চান। এ যেন ছেলের হাতে মোয়া চাইলেই পাওয়া যায়।

স্বপন আবার বলে ওঠে, সে যাই হোক, এভাবে একজন কি দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে হা-পিত্যেস করে বসে থাকা আর ওপারের কর্তাদের অনুযোগ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হবার মত অবস্থা আর বেশিদিন সহ্য করতে পারছি না, ভাই। নতুন এজেন্ট তৈরী করা ছাড়া আর কোন পথ দেখছি না।

জবাবে বড় দিলীপ জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বললে, পারো তো ভালই, তবে অতি লোভে তাঁতী নষ্ট হবার মত অবস্থা যেন না হয়। আমাকে বাপু প্রসন্ন ও কে. পি. সিংয়ের ওপরই ভরসা করে থাকতে হবে। নতুনের চাইতে পুরানোকে বিশ্বাস করা সহজ। আসলে এখন যা প্রয়োজন তা'হলো ওদের একটু চাঙ্গা করে তোলা। লোভের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে, মদ ও জুয়োর নেশায় ওদের জড়াতে হবে। পয়সার টান পড়লেই বাছাধনেরা মরীয়া হয়ে অফিস থেকে 'মাল' হাতিয়ে নিতে উঠে পড়ে লাগবে। আর তাতেই হবে আমাদের কার্যসিদ্ধি।

কথাটা শেষ করেই দিলীপ দরজার দিকে যেতে যেতে স্বপনের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে আবার বললে, যখন ডেকে পাঠিয়েছে তখন আজ নির্ঘাত কিছু 'মাল' হাতে আসবে।

বড় দিলীপ বেরিয়ে যায়। স্বপন খাটের ওপর দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে ভাবতে থাকে বড় দিলীপের কথা। লোকটা কথা-গুলো মিথ্যে বলে নি। নতুন এজেন্ট তৈরী করার ঝামেলা অনেক। তাতে বিপদের আশঙ্কা। তার চাইতে জুয়ো ও মদের সাহায্যে পুরানোদের আর্থিক অভাব সৃষ্টি করে তাদের দিয়ে কাজ

করানো অনেক সহজ। তবে তার নিজের বিপদ ঐ মনোরঞ্জনকে নিয়ে। বড় দিলীপের পক্ষে প্রসন্ন ও কে. পি. সিংকে জুয়ো-মদের পথে নিয়ে যাওয়া যত সহজ, তার নিজের পক্ষে মনোরঞ্জনকে ঐ পথে টেনে আনা অত সহজ নয়। মনোরঞ্জন দেখতে শুনতে সরল প্রকৃতির হলেও আসলে একটি আস্ত ঘুঘু। শিলিগুড়ি সহরের রবীন্দ্রনগরে বাস করে সপরিবারে। বড় দিলীপের কথা মত তাকে চাঙ্গা করে তুলে কাজ আদায় করা খুবই শক্ত।

স্বপন ও বড় দিলীপের কথাবার্তার মধ্যে সারাক্ষণ ঘরের এককোণে বসে স্থুঁচ-সুতো দিয়ে নিজের জামার বোতাম লাগাচ্ছিল ছোট দিলীপ। স্বপনকে চুপ করে থাকতে দেখে সে একবার আড়চোখে তাকায় তার দিকে। তার মুখের ভাবে ছোট দিলীপের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে প্রসন্ন ও কে. পি. সিং মারফত বড় দিলীপের মাল জোগাড় করার ব্যাপারে স্বপন তেমন খুশি নয়। হয়তো নিজে জোগাড় করতে পারছে না বলেই তার এই মনোভাব।

আরও একটু সময় নিঃশব্দে নিজের কাজ করে চলে ছোট দিলীপ। তারপর এক সময় স্থুঁচ-সুতো গুটিয়ে রাখতে রাখতে স্বপনের উদ্দেশে বললে, একটা কথা বলবো ভাইজান?

ছোট দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় স্বপন, বলো।

—আপনার মনোরঞ্জনকে বোধহয় আপনি ঠিক কব্জা করতে পারছেন না, তাই না?

ছোট দিলীপের কথায় স্বপন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। লোকটা থট্ রিডিং জানে নাকি? নইলে তার মনের কথা টের পেল কেমন করে?

স্বপনের জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই ছোট দিলীপ আবার বললে, মদ জুয়ায় যাকে কায়দা করা যাবে না তাকে কায়দা করতে হবে অন্য কিছু দিয়ে।

—কী সেই অন্য কিছু? স্বপনের কণ্ঠে কৌতূহল।

—মেয়েছেলে। জবাব দেয় ছোট দিলীপ।

জিজ্ঞেস করে স্বপন, তুমি কি ওকে খারাপ পাড়ার মেয়েছেলেদের কাছে নিয়ে যেতে বলছো?

—না—না, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে ছোট দিলীপ, খারাপ

পাড়ার মেয়েছেলে হতে যাবে কেন? মনোরঞ্জনের বাড়িরই মেয়েছেলে—ওর নিজের স্ত্রী।

—ওর স্ত্রী আবার এর মধ্যে এসে কী করবে?

হেসে জবাব দেয় ছোট দিলীপ, আর কিছু না পারুক, পয়সা কড়ির জন্যে মনোরঞ্জনের ওপর চাপ তো দিতে পারবে।

—কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? মনোরঞ্জনের স্ত্রীকে এসব কেমন করে বলা চলবে? তাছাড়া, মেয়েদের পেটে তো নাকি কিছু লুকানো থাকে না।

—তা যা বলেছেন ভাইজান, বলতে থাকে ছোট দিলীপ, তবে, চেষ্টা তো করতে হবে। ফজলুর ভাই তো দিব্বি প্রসন্নবাবু আর সিং সাহেবের কাছ থেকে ভাল ভাল মাল জোগাড় করে ওপারে পাঠাচ্ছে। আর আপনি যদি কিছু না করে চুপ করে থাকেন তাহলে দিনাজপুরের মেজর সাহেব তো আপনার ওপর চটে উঠবেন।

স্বপন চিন্তিত কণ্ঠে বললে, তা যা বলেছো। একটা কিছু করতেই হবে। নতুন এজেন্ট জোগাড় করতে হবে।

চায়ের দোকানে টেবিলের একপাশে বড় দিলীপ আর অন্য-পাশে প্রসন্ন ও কে. পি. সিং। মুখোমুখি বসে চা খেতে খেতে বড় দিলীপ চোখের ইশারায় কিছু জিজ্ঞেস করতেই প্রসন্ন তেমনি ইশারায় বড় দিলীপকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলে। মনে মনে খুশি হয় বড় দিলীপ। যাক, অনেকদিন পরে আজ হয়তো কিছু ভাল মাল পাওয়া যাবে।

বাস্তবিকই তাই। চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে একটা ছোট গলির জনবিরল অংশে এসে দাঁড়ায় তারা। প্রসন্ন ও কে. পি. সিং তাদের পকেট থেকে কাগজপত্র বের করতেই বড় দিলীপ সেগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে, কী এসব?

জবাব দেয় প্রসন্ন, আজ আমরা আপনার জন্যে যা এনেছি তা' হাতে পেয়ে পাকিস্তানে আপনাদের মেজর সাহেব আনন্দে নাচতে শুরু করবে।

—তাই নাকি? বড় দিলীপ দ্রুত চোখ বুলোতে থাকে সেই কাগজ-পত্রের ওপর।

সত্যিই ভাল জিনিস। উত্তরবঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর

অবস্থান সম্পর্কে প্রতিদিন নতুন যে সব সার্কুলার দিল্লী থেকে আসছে, তারই কপি ও সেইসঙ্গে একখানি বড় ম্যাপ যাতে রয়েছে ভারতীয় বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে খুঁটি-নাটি প্রত্যেকটি খবর যা নাকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সারা মুখে খুশি ছড়িয়ে পড়ে বড় দিলীপের। এতদিনে এমন কতগুলো কাগজপত্র পাওয়া গেল যা হাতে পেয়ে দিনাজপুরের মেজর লতিফই কেবল নয়, ঢাকার বড় কর্তা ব্রিগেডিয়ার সেলিম পর্যন্ত তাকে বাহবা না দিয়ে পারবেন না।

সন্তর্পণে কাগজগুলো নিজের এ্যাটাচি কেসের মধ্যে রেখে বড় দিলীপ বললে, এবারে আপনাদের পারিশ্রমিকের অঙ্ক নিশ্চয়ই কিছু বেশি হবে।

প্রসন্ন বলে ওঠে, এবার কিন্তু পুরোপুরি ডবল দিতে হবে।

আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বলে ওঠে বড় দিলীপ, ঠিক আছে—ঠিক আছে। তাই হবে। তবে ওপার থেকে না এলে তো পুরোটা আপনাদের দিতে পারবো না। কাল এখানে এই সময় অর্ধেকটা পাবেন, আর বাকিটা আগামী সপ্তাহে।

—বেশ—বেশ, তাতে কি? জবাব দেয় প্রসন্ন, দু'দিন আগে পরে হলে কিছু যাবে আসবে না।

—লেকিন পুরা ডাবল চাহিয়ে। প্রসন্নর কথার পাদপূরণ করে কে. পি. সিং।

অবশেষে প্রসন্ন ও কে. পি. সিং সেদিনের মত বিদায় নিতেই বড় দিলীপ খুশি মনে হাঁটতে থাকে নিজের ডেরার দিকে। মনে মনে হয়তো বলে, আমি ফজলুর রহমান হিন্দুস্থানের মাটিতে হিন্দু দিলীপ দের ছদ্মবেশে পাকিস্তানের জন্যে যে কাজ করে চলেছি তার মূল্যায়ন ওপারের কর্তারা নিশ্চয়ই একদিন করবেন।

এর পরের কাজটুকু নূর অর্থাৎ ছোট দিলীপের। যথা সময়ে প্রস্তুত হয়ে সে পাড়ি দেয় বুড়িমারি-চ্যাংড়াবাঁধা পথে ওপারে। বর্ডার পার হবার জন্যে সৈয়দ আলী মোল্লা ও ভগীরথ তো আছেই। সঙ্গে তার বড় দিলীপের দেয়া একটি কাগজের প্যাকেট যার মধ্যে রয়েছে সেই অমূল্য কাগজপত্র। দিনাজপুর থেকে ফেরার পথে সে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে মোটা টাকা যা দিয়ে হিন্দুস্থানের ঐ লোভী লোকগুলোর লোভ মেটাবার বদলে তাদের

লোভকে আরও উস্কে দিয়ে দেশদ্রোহী আচরণে তাদের উৎসাহ দেয়া হবে।

দেশদ্রোহীদের কথা ভেবে মাঝে মাঝে বিস্ময় বোধ করে নূর। এই মনোরঞ্জন, প্রসন্ন, কে. পি. সিং প্রভৃতি লোকগুলোর শিক্ষা-দীক্ষা তার নিজের চাইতে অনেক বেশি। এরা চাকরি করে এমন একটা বিভাগে যাদের হাতে রয়েছে দেশকে রক্ষা করার ভার। সামান্য কিছু পয়সা কড়ির বিনিময়ে সেই বিভাগের গোপন খবর তারা বিদেশী গুপ্তচরের কাছে পাচার করে কিভাবে? কেমন করে তারা নিজেদের জন্মভূমির স্বার্থ অন্যের কাছে বিলিয়ে দেয়? সে নিজে শিলিগুড়িতে জন্মগ্রহণ করলেও পাকিস্তানের নাগরিক। পাকিস্তানই এখন তার স্বদেশ। সেই স্বদেশের স্বার্থ এমনি ভাবে বিসর্জন দেবার কথা নূর তো ভাবতেই পারে না।

ভারতবর্ষের মাটিতে একদিন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছিল এমনি একদল অর্থ ও ক্ষমতা-লোভী দেশদ্রোহীর জন্যে।

নয় ॥

অনুভার ব্যাপারে ঘোরতর বিপাকে পড়েছে পাকিস্তানী গুপ্তচর ফজলুর রহমান ওরফে বড় দিলীপ। বাবা-মা'র অনুমতির কথা বলে আর তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না অনুকে। ইদানীং মেয়েটা যেন ক্ষেপে উঠেছে। দেখা হলেই সেই এক কথা—কবে বিয়ে হবে আমাদের? কবে এই লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাবো আমি?

অনুর প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতে পারে না বড় দিলীপ। কী জবাব দেবে সে? জবাব দেয়া মানে তো বিয়ে করা। কিন্তু এই মুহূর্তে বিয়ে-শাদীর মধ্যে যেতে মন চায় না তার। একদিন আকস্মিকভাবেই তার পরিচয় ঘটেছিল এই পরিবারটির সঙ্গে। সেই পরিচয় থেকেই অনুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। সেদিন সেই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু

ছিল না। অনুভার মনে যা-ই থাক্ না কেন, তার মনের খোঁজ নেবার অবসর সেদিন ছিল না বড় দিলীপের। সে কেবল চেয়েছিল একটি যুবতীর সান্নিধ্য। তা সে পেয়েছিল। কেবল পেয়েছিলই নয়, পুরোপুরি আদায় করেছিল। অবশেষে দুর্ঘটনা ঘটে যেতেই সতর্ক হয়ে উঠল বড় দিলীপ। কেবল সতর্কই নয়, চিন্তিতও বটে। এখন সে কী করে? দায়িত্ব এড়াতে চাওয়ার অর্থই হল ঝঞ্ঝাট ডেকে আনা। চাই কি, কেঁচো খুঁড়তে সাপও বেরিয়ে পড়তে পারে। তাহলে তো সমূহ বিপদ। আবার এই সহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। মস্ত বড় দায়িত্ব নিয়ে সে এসেছে এদেশে। গড়ে তুলেছে একটা গুপ্তচর চক্র। এই চক্রের ভালো-মন্দর সঙ্গে সে নিজে ও আব্দুল করিম অর্থাৎ স্বপন জড়িত। এখন তবে উপায়?

ইদানীং এসব চিন্তা নিয়ে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে থাকে বড় দিলীপ। তার এই অন্যমনস্কতা কিন্তু চোখ এড়ায় না স্বপনের। অবশেষে একদিন স্বপন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেই বসে তাকে। বললে, আচ্ছা, আজকাল তুমি কী নিয়ে এত চিন্তা করো বলো তো?

ম্লান হেসে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করে জবাব দেয় বড় দিলীপ, কী আর চিন্তা করবো? এই, এখানকার কাজকর্ম সম্পর্কে আর কি!

—উঁহু, অবিশ্বাসে মাথা নাড়ে স্বপন, তোমার ধরণ-ধারণ দেখে মনে হচ্ছে কোন একটা বিশেষ ব্যাপার নিয়ে আজকাল ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছ তুমি।

বড় দিলীপ এবার আর না হেসে শুকনো মুখে চুপ করে থাকে। স্বপন আবার বললে, তেমন কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে জানতে চাই না। তবে—। কথাটা শেষ না করেই সে থেমে যায়।

বড় দিলীপ গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে থাকে। অবশেষে এক সময় ধীরে ধীরে মাথা তুলে মৃদু কণ্ঠে বললে, ঠিকই ধরেছো তুমি। ভয়ানক একটা সমস্যায় পড়েছি।

কৌতূহলী চোখে স্বপন কেবল তাকিয়ে থাকে বড় দিলীপের মুখের দিকে।

আবার একটু সময় চুপ করে থেকে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় বড় দিলীপ। তারপর বললে, এই সহরের একটি মেয়ের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে আমার।

—বেশ তো, তা নিয়ে এত চিন্তার কি আছে? কী পরিচয় মেয়েটির? জিজ্ঞেস করে স্বপন।

জবাব দেয় বড় দিলীপ, মেয়েটির নাম অনু—অনুভা সাহা। মেয়েটি এখন বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছে।

—কেন, বেশিদূর এগিয়েছ নাকি?

সলজ্জ ভঙ্গিতে চুপ করে থাকে বড় দিলীপ।

—বুঝেছি। তা মেয়েটির পক্ষে বিয়ের জন্যে চাপ দেয়া তো স্বাভাবিক। তোমার আসল পরিচয় জানিয়েছ নাকি তাকে?

মাথা নেড়ে জবাব দেয় বড় দিলীপ, না। সে আমাকে দিলীপ দে বলেই জানে।

একটু ভেবে স্বপন আবার বললে, সোজাসুজি বলে দিলেই তো পারো যে এই বিয়েতে তোমার বাবা-মা'র মত নেই।

—তাতে কি কমলি আমাকে ছাড়বে?

—তাহলে কি করতে চাও?

—অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে শেষপর্যন্ত বোধহয় তাকে বিয়ে করতেই হবে।

—বেশ তো, তবে তাই করো। বলতে থাকে স্বপন, দু'দেশে দুটো সংসার। পাকিস্তানে রয়েছে তোমার মুসলমান স্ত্রী ও দু'টো মেয়ে। আর, হিন্দুস্থানে থাকবে হিন্দু স্ত্রী। ব্যবস্থা মন্দ নয়। এর একটা সুবিধেও আছে।

—কি সুবিধা? জিজ্ঞেস করে বড় দিলীপ।

জবাব দেয় স্বপন, এদেশে বিয়ে করে সংসার পেতে বেশ ফলাও করে কাজ-কর্ম চালাতে পারবে। কেউ সহসা সন্দেহ করতে পারবে না তোমাকে।

—যদি কোনদিন অনুর কাছে আমার আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে?

—কেমন করে প্রকাশ হবে? আর যদি তা' হয়-ই তো জেনে রেখো তোমার হিন্দু স্ত্রীর কাছ থেকে তোমার কোন অনিষ্টের আশংকা থাকবে না।

—কেন?

—যেহেতু ততদিনে তুমি হবে তার সন্তানের বাপ। নিজের

সন্তানের সামাজিক পরিচয়ের জন্যই কিল খেয়ে কিল হজম করার মত সে তোমার আসল পরিচয় গোপন রাখবে।

—আর যদি উল্টো হয়? যদি সে তা' গোপন না রাখে?

—তাহলে কিন্তু সত্যিই বিপদ। তাই তো সর্বদাই চেষ্টা করতে হবে যাতে তোমার আসল পরিচয় সে জানতে না পারে। স্ত্রী যতই বুদ্ধিমতী হোক্ না কেন, তার পক্ষে তার স্বামী হিন্দু কি মুসলমান তা বুঝতে পারা খুব একটা সহজ নয়, বিশেষ করে স্বামী যদি চাল-চলন কথা-বার্তায় একটু সতর্ক থাকে।

বড় দিলীপ আর কোন জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবতে থাকে। তারপর এক সময় স্বপনের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি ভাই বেশ আছো। আমি এখানে এসব করতে গিয়েই মরেছি। আচ্ছা, পাকিস্তানে তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কে আছে?

ম্লান কণ্ঠে জবাব দেয় স্বপন, আর কেউ নেই।

—ছেলে-মেয়ে?

—না, ছেলে-মেয়ে হয় নি। বোধহয় কোনদিন হবেও না।

—তাহলে তো ছেলে-মেয়ের জন্যেই তুমি আবার বিয়ে করতে পারো।

—হ্যাঁ, পারি। কিন্তু তা আমি করবো না। আমার বিশ্বাস এই অবস্থায় শরিয়তি আইন মেনে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে ছেলে-মেয়ে হয়তো পেতে পারি, কিন্তু তাতে শান্তি পাবো না।

—কেন?

—একজন নিরপরাধ সন্তানহীনার মনে কষ্ট দিলে তার উষ্ণ নিঃশ্বাসে শান্তি পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলেই আমার ধারণা।

সেই মুহূর্তে বড় দিলীপের মনে হয় স্বপন তার চেয়ে মানসিকতার দিক দিয়ে অনেক বড়। পাকিস্তানে তার স্ত্রী নিঃসন্তান। তবুও কিন্তু এ নিয়ে তার কোন অনুযোগ নেই। এমন কি, সেই সুযোগ নিয়ে এখানে কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতেও তার ইচ্ছে নেই। আর পাকিস্তানে স্ত্রী ও মেয়ে থাকা সত্ত্বেও সে কিনা নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে বসেছে! এখন সেই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তাকে এখানে আর একটা সংসার পাততে হবে!

বাড়ির অন্য কেউ টের না পেলেও শেফালি কিন্তু তার

দিদির ব্যাপারটা টের পেয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল যে তাদের দিলীপদার সান্নিধ্যে এসে তার দিদি একটা অঘটন ঘটিয়ে বসেছে। যেদিন থেকে সে এটা বুঝতে পেরেছে সেইদিন থেকেই বড় দিলীপের ওপর বিরক্তিতে তার মন ভরে উঠেছে। বড় দিলীপ এ বাড়িতে এলে যে সাধারণ রসিকতা, সরস মন্তব্য দিয়ে একটা হালকা আবহাওয়া সে গড়ে তুলতো সেসব একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে শেফালি। আজকাল তার কেবলই মনে হয় ঐ লোকটি চোর। সে তার দিদির সর্বস্ব চুরি করে এখন বক-ধার্মিক সেজে থাকার চেষ্টা করছে। বড় দিলীপ ডাকাডাকি করলেও সহসা শেফালি আর আসে না তার কাছে। এলেও এমন গম্ভীর হয়ে থাকে যে বড় দিলীপের সাহস হয় না তার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করতে।

একদিন বড় দিলীপ সাহস করে কথাটা জিজ্ঞেস করতেই সাপের ফণা তোলার মত ফোঁস করে ওঠে শেফালি। ঘাড় বেঁকিয়ে বড় দিলীপের দিকে তির্যক চোখে তাকিয়ে বললে, কাপুরুষের সঙ্গে মিশতে এমনকি কথা বলতেও আমার ভাল লাগে না।

শেফালির কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে কিছুক্ষণ সময় নেয় বড় দিলীপ। তারপর ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, আমাকে তুমি কাপুরুষ বলছো, শেফালি?

ভ্রূ-ভঙ্গি করে জবাব দেয় শেফালি, কাপুরুষকে কাপুরুষ না বলে কি মহাপুরুষ বলবো?

—কাপুরুষের মত কোন কাজ করেছি বলে তো মনে পড়ছে না। বড় দিলীপ বললে।

জবাবে শেফালি বললে, যারা মেয়েদের সঙ্গে মিশে তাদের দুর্বলতার সুযোগ নেয়, তাদের কাপুরুষই বলে। অসহায় মেয়ে-দের বিপদ ও লজ্জার মধ্যে টেনে এনে যারা নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে চায় তাদের কাপুরুষ ছাড়া আর কী বলা চলতে পারে?

—কে বলেছে যে আমি দায়িত্ব এড়াতে চাইছি?

—দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার কোন চিহ্ন তো দেখছি না।

এতক্ষণে স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দেয় বড় দিলীপ, আমি তোমার দিদিকে বিয়ে করবো।

—ভাল কথা। ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটে ওঠে শেফালির।

—তখন নিশ্চয়ই আর কাপুরুষ বলবে'না আমাকে
—না বলার সম্ভাবনাই বেশি।
—তখন বুঝি আমি মহাপুরুষ হয়ে উঠবো?
—না, তা নয়। কাপুরুষ মহাপুরুষ কোন কিছুই নয়। তখন কেবল পুরুষ। সত্যিকারের পুরুষরাই দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে জানে।

বৃদ্ধা হলেও অনুভাদের পিসীমা স্ত্রীলোক। কেবলমাত্র চোখের দেখা দেখেই স্ত্রীলোকেরা পরস্পরের এমন অনেক খবরই জোগাড় করে ফেলে যা জানতে পুরুষকে হয়তো প্রশ্নের বন্যা বইয়ে দিতে হয়।

সেই চোখের দেখা দেখেই হঠাৎ একদিন সেই বৃদ্ধা তার ভাইঝি সম্পর্কে অনেক খবর জোগাড় করে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্কে শিউরে উঠলেন তিনি। সর্বনাশ, হতভাগা মেয়েটা এ কী করে বসেছে! এখন উপায়?

কেবল অনুভার এই বৃদ্ধা পিসিমাই নন, অনুভার খবর ততদিনে পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই জেনে ফেলেছে। এ নিয়ে পাড়ার মেয়েমহলে কানাকানি, চোখ টেপাটেপি। কেউ কেউ বোকা বলেই মনে করে অনুভাকে। একালে এটা একটা সমস্যাই নয়। ঘটনা যখন ঘটেই গেছে তখন এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। কিন্তু তা' না করে বোকা মেয়েটা দিব্বি চুপ করে আছে। অবশ্যি, তাছাড়া উপায় বা কী? গার্জেন বলতে তো কেবল ঐ বুড়ি পিসি। সোমত্থ দু'দুটো মেয়েকে ঐ বুড়ির ওপর ফেলে রেখে মা-বাবা তো দিব্বি নেফায় গিয়ে বাস করছে। দেখবে কে ওদের? সামলাবে কে? কাজেই যা হবার তাই হয়েছে। ছেলেটা যদিও এখনও মাঝে মধ্যে ঐ বাড়িতে আসে কিন্তু দু'দিন পরে নির্ঘাৎ কেটে পড়বে। তারপরেই হবে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত!

এসব ব্যাপারে প্রতিবেশীদের চোখ থেকেই ঘুম চলে যায় আগে। অনুভার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। এসব অনাচার কি আর সহ্য করা যায়? অবশেষে একদিন এক প্রতিবেশিনী অনুর পিসিমার কাছে প্রসঙ্গটা তুলতেই বৃদ্ধা ম্লান মুখ করে বললেন, আমি আর কী করতে পারি? নেফায় চিঠি লিখে সব জানিয়েছি। এখন তারা যা ভাল বুঝবে করবে।

—কিন্তু মেয়েটার ভবিষ্যৎ যে নষ্ট হতে বসেছে। এর পরে

ঐ মেয়েকে কি কেউ আর বিয়ে করবে ?

জবাব দেন অনুর পিসি, তা' তো বটেই। তবে শুনেছি ছেলেটা নাকি ঐ হতভাগীকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে।

—হুঁঃ, এসব কথার দাম কি ? কথা দিয়ে যে কথা রাখবে তার নিশ্চয়তা কোথায় ? কিছু মনে করো না, দিদিমা। আসলে তোমার ঐ নাতনীটিই তেমন সুবিধের নয়। আরে বাপু, সুযোগ পেলে ছেলেরা তো একটু-আধটু ছুঁক ছুঁক করবেই। তাই বলে, তুই মেয়ে হয়ে নিজের ভাল বুঝবি না কেন ?

—তা'তো বটেই। প্রতিবেশিনীর কথায় সায় না দিয়ে উপায় থাকে না অনুর পিসির।

অবশেষে একদিন প্রতিবেশীদের সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটলো। জানা গেল সেই ছোক্রাটা নাকি সত্যিই বিয়ে করবে অনুকে। নেফা থেকে অনুর বাবা-মাও নাকি এ ব্যাপারে তাদের সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে।

প্রতিবেশীদের যেন একটু আশাভঙ্গ হলো। মৌখিক সহানুভূতির আড়ালে সমস্যার জটিলতাই তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই জটিলতারই যে অবসান ঘটতে চলেছে। তাহলে যে গোটা ব্যাপারটাই পানসে হয়ে উঠবে।

খবরটা মোটেই মিথ্যে নয়। অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে বড় দিলীপ ঠিক করেছে যে সে অনুকে বিয়ে করবে। এতে তার এখানকার কাজ কর্মে খানিকটা সুবিধেই হবে। তাছাড়া এতদিন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশায় মেয়েটার ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়েছে তার। অনু এতকাল তার মুখের কথাকেই বিশ্বাস করেছে। আজ তার সঙ্গে অবিশ্বাসের কাজ করা উচিত নয়। তাকে সে বিয়েই করবে।

কিন্তু বড় দিলীপ অনুকে বিয়ে করলেই কি তার বিশ্বাসের মর্যাদা দেয়া হবে ? এভাবে নিজের আসল পরিচয় গোপন করা কি অন্যায় নয় ? অনু যেদিন তার সম্পর্কে সবকথা জানতে পারবে সেদিন সে কী করবে ?

কী করবে তা সঠিক বলতে পারে না বড় দিলীপ। ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে এখন কোন লাভ নেই। যা হবার

হবে। তাই বলে এখনই সে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিতে পারে না।

এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার পরেও কিন্তু মনের শঙ্কা যায় না বড় দিলীপের। একদিন আবার সে জিজ্ঞেস করেছিল স্বপনকে। জবাবে স্বপন একটু হেসে বলেছিল, ভবিষ্যতের কথা না-হয় ভবিষ্যতে ভাবা যাবে।

—কিন্তু সেদিন যদি অনু আমাকে কোন রকম বিপদে ফেলে?

মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল স্বপন, মেয়েদের ব্যাপারে বিশেষ করে হিন্দু মেয়েদের ব্যাপারে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, ফজলুর। স্বামী যাই হোক না কেন, সে তার কাছে দেবতা। বিশেষ করে স্বামীর সন্তান পেটে ধরে কোন হিন্দু মেয়ে সহসা তার স্বামীকে বিপাকে ফেলতে চায় না। ধর্ম ওদের কাছে নিশ্চয়ই বড়, কিন্তু তার চাইতেও বড় স্বামী।

॥ দশ ॥

অবশেষে একদিন সত্যি সত্যিই বিয়ের শাঁখ বাজালো অনুদের বাড়িতে। সেদিনটা ছিল ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসের এক শীতের রাত।

দিলীপ দে ওরফে ফজলুর রহমানের বিয়ে। নাম ভাড়িয়ে অন্য ধর্মের একটি মেয়েকে বিয়ে করা ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী অপরাধ। কাজেই বিয়ের দিন বর বেশে সাজতে সাজতে মনটা স্বাভাবিক কারণেই একটু কেঁপে উঠেছিল তার। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়েছিল নিজেকে। সাময়িক দুর্বলতা ও জৈবিক প্রয়োজনে একদিন সে যে মেয়েটির ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তার কাছ থেকে পালিয়ে না গিয়ে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাওয়া নিশ্চয়ই কোন অপরাধ নয়। তবে হ্যাঁ, পাকিস্তানে তার মুসলিম স্ত্রীর কাছে সে অপরাধী। তার অজ্ঞাতসারে আর একটা বিয়ে করা অবশ্যই অপরাধ। তবে শরিয়তী নিয়মে কোন অন্যায় নয়।

বজরংবলী বরফওয়ালার বাড়ির ভাড়াটে ঘরে নিজেকে প্রস্তুত করছিল বড় দিলীপ। তাকে সাহায্য করছিল ছোট দিলীপ অর্থাৎ নূর ইসলাম। বড় দিলীপের শান্তিপুরী ধুতির কোচা ঠিক করতে করতে ছোট দিলীপ একসময়ে বললে, সবই তো হলো, ভাইসাব। এখন শেষ রক্ষা হলে হয়।

—কেন, শেষরক্ষা হবে না কেন? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বড় দিলীপ।

ছোট দিলীপ জবাব দেয়, হিন্দু সেজে তো বিয়ে করতে চললেন; হিন্দুর বিয়ের নিয়ম-কানুন জানেন তো?

বড় দিলীপ ছোট দিলীপের কথায় খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কথাটা মিথ্যে নয়। এ নিয়ে সে নিজেও অনেকবার ভেবেছে কিন্তু সমাধানের কোন পথ খুঁজে পায় নি।

বড় দিলীপের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট দিলীপ আবার বললে, যাকগে, যা হবার হবে। পুরুত ঠাকুর যা করতে বলবে, করবেন। ঠাকুর দেবতাদের যখন প্রণাম করতে বলবে, তাই করবেন। ব্যাস্‌, তা'হলেই হবে।

—কিন্তু—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায়—বড় দিলীপ।

ছোট দিলীপ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বড় দিলীপের দিকে তাকাতেই নিজের কথার খেই ধরে বলতে থাকে বড় দিলীপ, তা' না হয় হলো। পুরুতের কথামতই না হয় চললাম। কিন্তু হিন্দুদের ঐ মেয়েদের আসরে গিয়ে যদি কোন বিপদে পড়ি? শুনেছি, সেখানে নাকি কোন পুরুত থাকে না।

—মেয়েদের আসর? সেটা আবার কি? জিজ্ঞেস করে ছোট দিলীপ।

বড় দিলীপ জবাব দেয়, ঐ যে—বিয়ের পরে মেয়েদের আসর—

—হায় আল্লা, বলে ওঠে ছোট দিলীপ, আসর নয়, ওকে বলে বাসর। বিয়ের পরে আপনাকে আর ভাবীকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসিয়ে মেয়েরা হাসি-তামাসা করবে। ঠিকই শুনেছেন, ওখানে কোন পুরুত থাকে না, এমনকি অন্য পুরুষেরাও সেখানে যায় না।

—তুমি দেখছি হিন্দু বিয়ের অনেক কিছুই জানো। বড় দিলীপ বললে।

একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে ছোট দিলীপ বললে, হ্যাঁ, কিছু কিছু জানি। আমার মা তো ছিল হিন্দু।

—বাসরের নিয়ম-কানুন তো কিছুই জানি না। বড় দিলীপের কণ্ঠে দুশ্চিন্তার স্পর্শ।

একটু সময় চুপ করে থাকে ছোট দিলীপ। তারপর বললে, সেখানে মেয়েরা যা করতে বলবে করবেন। বেশি কিছু বললে বলবেন, আগে তো আর বিয়ে করিনি যে সব কিছু জেনে ফেলবো। এসব মেয়েদের ব্যাপার আমার জানা নেই। তা'ছাড়া—।

বড় দিলীপ তাকায় ছোট দিলীপের দিকে। বলতে থাকে ছোট দিলীপ, তা'ছাড়া আমার তো মনে হয় আপনাদের এই বিয়েতে ঐ বাসর-ফাসর নিয়ে তেমন কিছু হবে না। আপনি তো ঐ বাড়ির পরিচিত। অনেক যাতায়াত করেছেন।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। শিলিগুড়ি সহরের প্রশস্ত রাস্তা ধরে চলেছে রিক্সার সারি। বর চলেছে বিয়ে করতে। সঙ্গে কয়েকজন বরযাত্রী। তাদের মধ্যে রয়েছে স্বপন, ছোট দিলীপ ও বড় দিলীপের কয়েকজন স্থানীয় বন্ধু। এই বন্ধুদের কাছে বড় দিলীপ দিলীপ দে নামেই পরিচিত।

বরের বেশে বড় দিলীপকে মানিয়েছেও বেশ। এমনিতে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা সার্ভে সেকশনের লেফটেনাণ্ট ফজলুর রহমানের চেহারা খারাপ নয়। তার ওপর পরনে শান্তিপুরের ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী। পাশে বসে থাকা এক বন্ধুর হাতে বরের টোপর। বন্ধুর পীড়াপীড়িতেও কিন্তু টোপর মাথায় দেয়নি বড় দিলীপ। বলেছিল, এখন থাক, ওবাড়িতে গিয়ে না হয় মাথায় দেব।

বড় দিলীপের মুখখানা গম্ভীর। উদ্বেগাকুল মন নিয়ে সে চলেছে বিয়ে করতে। পাকিস্তানে মুসলমানী মতে প্রথম বিয়ে হয়েছিল তার। সেদিনের মানসিক অবস্থার সঙ্গে আজকের এই মানসিক অবস্থার কোন তুলনাই চলে না। সেদিন ছিল স্বপ্নে ঘেরা এক বিচিত্র অনুভূতি যা নাকি বিয়ের সময় প্রতিটি পুরুষই অনুভব করে থাকে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে বড় দিলীপের মনের অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। এর সঙ্গে মিশে রয়েছে শঙ্কা ও ভয়। ধরা পড়ে যাবার শঙ্কা, সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবার ভয়,

একটি নিরপরাধ হিন্দু যুবতীকে ফাঁকি দিতে হিন্দুর বেশে সেজে-গুজে চলেছে ফজলুর রহমান। মনের শঙ্কা দূর করতে মনে মনে সে আউড়ে চলেছে কোরান শরীফের কয়েকটি সুরা।

বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের প্রতিটি পর্বেই বড় দিলীপকে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে যেতে হয়েছে। নিয়ম-কানুন তার কিছুই জানা নেই। পুরুত ঠাকুরের নির্দেশই তাই একমাত্র সম্বল। এ নিয়ে কিন্তু কেউ কোন সন্দেহও করেনি। উপস্থিত সবাই এটাকে একজন আধুনিক যুবকের স্বাভাবিক অজ্ঞতা বলেই ধরে নিয়েছিল। ছোট শালী শেফালি তো একসময় বলেই ফেললে, জামাইবাবু যেন কী! আচমন করতে হলে জল মাথায় না ছিটিয়ে যে মুখে দিতে হয় সেই জ্ঞানটুকুও জামাইবাবুর নেই! ব্যাপারটাকে ঢাকতে গিয়ে বড় দিলীপ কিছু না বলে কেবল সামান্য একটু হেসে শেফালির দিকে তাকিয়েছিল। সম্প্রদানের সময় বরবেশী বড় দিলীপ অনুভার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে পুরুত-ঠাকুরের পড়ানো সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের বদলে কোরাণ শরীফের কোন সূরা মনে মনে উচ্চারণ করেছিল কিনা তা' একমাত্র সে নিজেই জানে।

দেখে-শুনে বিয়ের বদলে নিজেদের পছন্দ করা বিয়ে বলে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি রাখেনি অনুর আত্মীয়স্বজনেরা। তবে নিয়ম অনুযায়ী একটি ছোট্ট ছেলেকে কনের কোলে বসিয়ে দেবার সময় আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ বোধহয় মুখটিপে একটু হেসে-ছিল। আরে বাপু, কনে তো ছেলে পেটে নিয়েই বসে আছে, আর একটি ছেলেকে কোলে বসাবার দরকার কি?

বিয়ের অনুষ্ঠানের পরে বড় দিলীপকে একান্তে ডেকে স্বপন ফিস্ ফিস্ করে বললে, ভালয় ভালয় তো সব শেষ হলো। এবার নতুন বৌকে নিয়ে তুলবে কোথায়?

জবাবে বড় দিলীপ একটু সময় ভেবে নিয়ে বললে, আপাততঃ তো এখানেই থাকবে। তারপর দেখেশুনে কোথাও একটা ঘর ভাড়া করে—

বড় দিলীপের কথা শেষ না হতেই বলে ওঠে স্বপন, হিন্দুদের মধ্যে বিযের পরের দিনই বৌ নিয়ে চলে যাওয়া রীতি। এখানকার সবাই জানে যে তোমার বাড়ি দমদমে। এই বিয়েতে তোমার

মা-বাবার সম্মতির কথা যখন ওঠেনি তখন নতুন বৌকে নিয়ে দমদমে যাবার প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু তাই বলে বৌকে বাপের বাড়ি রেখে দেয়াও ঠিক নয়। লোকে নানারকম সন্দেহ করতে পারে। তার চাইতে বৌ নিয়ে বজরংবলী বরফওয়ালার বাড়িতেই গিয়ে ওঠো। তারপর একখানা ভাড়া বাড়ি যোগাড় করতে চেষ্টা করো।

—তা' না হয় হলো, বলতে থাকে বড় দিলীপ, কিন্তু ঐ একখানা ঘরে—

—না-না, সে তোমায় ভাবতে হবে না। যতদিন একখানা বাড়ি জোগাড় করতে না পারছো ততদিন আমি ও নূর না হয় কোন হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করবো।

—তা কেমন করে হয়? প্রতিবাদ করে বড় দিলীপ, আমাদের জন্যে তোমরা কষ্ট করবে কেন? তাছাড়া, এতে তোমার কাজ-কর্মেরও অসুবিধে হবে।

জবাবে মৃদু হেসে স্বপন বললে, আমার কাজকর্ম নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। নিজের কাজ-কর্মের ব্যাপারে সজাগ থেকো। কাজ ভুলে নতুন বৌ নিয়ে মেতে থাকলে দিনাজপুরের সার্ভে সেকশানের মেজর সাহেবের তাড়া খেতে হবে।

অবশেষে বড় দিলীপ বিয়ের পরের দিন অনুভাকে নিয়ে এসে তুললো বজরংবলী বরফওয়ালার বাড়িতে। বাড়িতে কোন মেয়ে-ছেলে নেই, কাজেই প্রতিবেশী মহিলাদেরই এগিয়ে আসতে হলো বধূ বরণ করতে। অনুষ্ঠান শেষে বড় দিলীপ মনে মনে বিস্মিত হয় হিন্দুদের বিয়েতে অনুষ্ঠানের ঘটা দেখে। এর মধ্যে অধিকাংশ অনুষ্ঠানকেই অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল তার। অনুদের বাড়িতে বাসি বিয়ের দিন কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে এমনি ধরনের একটি কথা তার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল। কথাটা শুনে একজন বর্ষীয়সী মহিলা বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, সেকি বাবা, বিয়েতে এসব লোকাচার এর আগে কখনও দেখ নি নাকি?

তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করতে গিয়ে জবাব দিয়েছিল বড় দিলীপ, না-না, দেখবো না কেন? তবে এসবের ঠিক কোন অর্থ খুঁজে পাই নি।

—লোকাচারের আবার অর্থ হয় নাকি? মা-মাসি, ঠাকুরমা-দিদিমারা এসব করেছেন, আমরাও করছি। ভবিষ্যতে আমাদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিরাও হয়তো এসব করবে। তা বাবা, তোমরা একালের ছেলে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বোধহয় এসব পছন্দ করো না।

জবাব দিয়েছিল বড় দিলীপ, না ঠান্‌দি, আমার নিজের অবিশ্যি এসব খারাপ লাগে না।

বড় দিলীপ কিন্তু মন-রাখা কথা বলেনি। বিয়ের অনুষ্ঠানে হিন্দুদের এসব লোকাচার বাস্তবিকিই তার কাছে বিচিত্র বলে মনে হয়েছিল।

বড় দিলীপ ও অনুকে ঘরখানা ছেড়ে দিলেও স্বপন ও ছোট দিলীপকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হোটেলে আশ্রয় নিতে হয়নি। বাড়িওয়ালার দয়ায় তার বাইরের ঘরখানায় থাকার অনুমতি পেয়েছিল তারা। খাওয়া-দাওয়া বড় দিলীপের বাড়িতেই। ঘরকন্নার কাজে অনু বরাবরই তুখোড়। তাই বিয়ের চেলি ছেড়েই যেমনি সে বড় দিলীপের রান্নাঘরে প্রবেশ করেছিল তেমনি স্বামীর সহকর্মী দু'জনের খাওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেও তার আপত্তি হয়নি। এই সূত্রে বড় দিলীপের ঘরে মাঝে মাঝেই স্বপন ও ছোট দিলীপের আড্ডা বসতো। অনুর সাথে হাসি-ঠাট্টা করতো স্বপন। অনুও জবাব দিতো। ছোট দিলীপ তার এই নতুন ভাবীর ফাই-ফরমাস খাটাতো।

একদিন অনুর অনুপস্থিতিতে স্বপন বড় দিলীপকে ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করে, কেমন লাগছে হিন্দু বৌ?

সলজ্জ হেসে জবাব দেয় বড় দিলীপ, লাগালাগির আর কী আছে? মেয়ে মেয়েই। তা' সে হিন্দুই হোক, আর মুসলমানই হোক।

স্বপন আবার বললে, হিন্দুস্থানের হিন্দু বৌ পেয়ে পাকিস্তানের মুসলমান বৌটিকে ভুলে যেওনা।

বড় দিলীপ এবার একটু গম্ভীর সুরে জবাব দেয়, তোমার কি মনে হয় আমি তাদের কথা ভুলে যাবো?

জবাব দেয় স্বপন, ইতিহাস কিন্তু তাই বলে। সেকালে মুসলমান নবাব-বাদশাদের কাছে মুসলমান স্ত্রীর চাইতে হিন্দু

স্ত্রীর কদর ছিল বরাবরই বেশি। সম্রাট আকবর তাঁর হারেমের বেগমদের মধ্যে সব চাইতে ভালোবাসতেন তাঁর হিন্দু-স্ত্রী যোধা-বাঈকে। তার পেটের ছেলেই তো পরবর্তীকালের সম্রাট জাহাঙ্গীর।

কথাটা শেষ করে স্বপন হো-হো করে হেসে উঠতেই রান্নাঘর থেকে দু'কাপ চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে অনু। স্বপনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সে বললে, ওকি ঠাকুরপো, এত হাসির ঘটা কিসের?

চায়ের কাপটা অনুর হাত থেকে নিজের হাতে নিতে নিতে স্বপন কেবল জবাব দেয়, না বৌদি, তেমন কিছু নয়। আপনা-দের নতুন ঘরকন্নার একটু খবরাখবর নিচ্ছিলাম।

—পরের ঘরকন্নার খবর নিয়ে আর লাভ কি ঠাকুরপো? হেসে বলতে থাকে অনু, এবার নিজের ঘরকন্নার একটু খোঁজ খবর করুন। বলেন তো আমিও চেষ্টা করতে পারি।

—না বৌদি, সে সময় এখনও হয় নি। হলে আপনাকে খবর দেব। কথাটা বলে স্বপন চায়ে একটা দীর্ঘ চুমুক দেয়। আর সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে তার পাকিস্তানের স্ত্রীর কথা। নিঃসন্তান বেচারী কেবল তার পথ চেয়েই একক জীবন যাপন করছে।

এতদিনে একখানা ভাড়া বাড়ি জুটলো বড় দিলীপের। খবরটা অবশ্য দিয়েছিল স্বপনের সেই এজেন্ট মনোরঞ্জন সরকার।

মনোরঞ্জন সপরিবারে থাকে সহরের রবীন্দ্রনগরে। সেখানে যে বাড়িতে সে ভাড়া থাকে সেই বাড়িরই একজন ভাড়াটে চলে যাওয়ায় খালি হয়েছিল একটা ঘর।

মনোরঞ্জনের কাছ থেকে স্বপন মারফৎ খবরটা শুনেই বড় দিলীপ একদিন এসে হাজির হয় সেখানে। বাড়িওয়ালী স্ত্রীলোকটির নাম সুন্দরী। একমাত্র কন্যা রূপাকে নিয়েই তার সংসার। বাড়ি ভাড়ার টাকাতেই তার সংসার চলে।

বড় দিলীপের কথায় মধ্যবয়সী বিধবা সুন্দরী বললে, হ্যাঁ বাবা, ঘর তো একখানা খালি হয়েছে। তবে যা দিনকাল পড়েছে তাতে অপরিচিত কাউকে ভাড়া দিতে ঠিক ভরসা হয় না। শিলিগুড়ি শহর তো এখন বারো ভূতের আড্ডা। হিল্লী-দিল্লীর লোক এখন এখানে। বাড়ি ভাড়া দিয়ে শেষে ভাড়ার টাকা

আদায় করতে মামলা-মোকর্দ্দমা করার সামর্থ্য আমার, নেই বাবা।

বড় দিলীপ বলে, না-না, আপনাকে ভাড়ার টাকা-পয়সা নিয়ে ভাবতে হবে না। মাসের প্রথমেই আপনি আপনার ভাড়া পাবেন। তা'ছাড়া, মনোরঞ্জনবাবুও আমাকে চেনেন।

—মনোরঞ্জনবাবু? কোন্ মনোরঞ্জন? জিজ্ঞেস করে সুন্দরী।

বড় দিলীপের বদলে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ষোল-সতেরো বছরের যুবতী রূপা এবার বলে ওঠে, মনোরঞ্জন সরকারের কথা বলছেন? আমাদের ভাড়াটে মনোরঞ্জন মামা আপনাকে চেনেন নাকি?

—হ্যাঁ, খুব ভালো চেনেন। তিনি বোধহয় এখন বাড়ি নেই। এলে জিজ্ঞেস করবেন আমার কথা। তাঁর কাছ থেকেই তো আমি এখানকার খবর পেয়েছি।

জবাব দেয় সুন্দরী, আচ্ছা বাবা, জিজ্ঞেস করে দেখবো। মনোরঞ্জন তো আমার এখানে অনেকদিন আছে। ব্যাংডুবির মিলিটারীতে কাজ করে। ও যদি বলে তো তোমাকে ঘর ভাড়া দিতে আমার একটুও আপত্তি হবে না।

মনোরঞ্জনের সুপারিশে বড় দিলীপ সুন্দরী বাড়িউলীর ঘর ভাড়া পেলেও বড় দিলীপের সঙ্গে তেমন একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মায়নি তার। মনোরঞ্জন স্বপনের এজেন্ট। সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সে পাকিস্তানে পাচার করে এই স্বপনের মারফত। কাজেই বড় দিলীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় পাছে স্বপন কিছু সন্দেহ করে সেই ভয়েই সে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেনি বড় দিলীপের সঙ্গে। কিন্তু ওর স্ত্রী অনু নাছোড়বান্দা। সে অনেকটা গায়ে পড়েই মনোরঞ্জনের, বিশেষ করে তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে। মনোরঞ্জনের ছোট ছেলেটাকে আদর করে, ঘরে নিয়ে গিয়ে নাওয়ায় খাওয়ায়। মনোরঞ্জনের স্ত্রী খুশি হয়ে স্বামীকে বলে, এই নতুন বৌটি কিন্তু বেশ মিশুক।

—কার কথা বলছো? জিজ্ঞেস করে মনোরঞ্জন।

জবাব দেয় মনোরঞ্জনের স্ত্রী, বলছি ঐ দিলীপবাবুর স্ত্রী অনুভার কথা। বেশ সরল প্রকৃতির বৌটি।

মনোরঞ্জন কোন জবাব না দিয়ে চুপ্ করে থাকে। সেই মুহূর্তে ঐ সরল মেয়েটার জন্যে বড়ই দুঃখ হয় তার। মেয়েটি জানেনা তার স্বামীর আসল পরিচয়। যেদিন জানতে পারবে

সেদিন আর তার দুঃখের শেষ থাকবে না। আজ হোক্ কাল হোক্ দিলীপ দে'র মধ্য থেকে একদিন ফজলুর রহমান বেরিয়ে আসবেই। সেদিন আর ফিরে যাবার পথ থাকবে না ঐ সরল মেয়েটার।

প্রথমে অনুকে নিয়ে বড় দিলীপ, তারপরে স্বপন। বজরংবলী বরফওয়ালার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে স্বপনও এসে হাজির হলো এই রবীন্দ্রনগরে। সুন্দরীর আর একখানা ঘর ভাড়া নিলে সে। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করলে মনোরঞ্জন। এই ব্যবস্থায় মনোরঞ্জন নিজেও খুব খুশি। পাশাপাশি সে ও স্বপন। মিলিটারী ম্যাপ্, ব্লু-প্রিণ্ট ও আন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র অফিস থেকে চুরি করে নিয়ে এসে সরাসরি স্বপনের হাতে তুলে দিতে ইদানিং খুবই সুবিধে তার। স্বপনও এরকম একটা ব্যবস্থাই চাইছিল। কাজের ব্যাপারে রেষারেষি থাকলেও বড় দিলীপের সঙ্গে যোগাযোগ তাকে রাখতেই হবে! দিনাজপুরের মেজর লতিফেরও তাই নির্দেশ।

ভাগ হয়ে গেল তিনজনের সংসার। হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে বড় দিলীপ এখন ঘোর সংসারী। স্বপনও গিয়ে আলাদা বাসা নিলে সেখানে। কাজেই নূর ইসলাম অর্থাৎ ছোট দিলীপের পক্ষে বরফওয়ালার বাড়িতে না থেকে আর উপায় রইলো না।

নতুন এই ব্যবস্থায় ছোট দিলীপের অসুবিধেই সবচাইতে বেশি। স্বপন ও বড় দিলীপের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাই একটা সমস্যা। কিন্তু উপায় নেই। যোগাযোগ তাকে রাখতেই হবে। সে হচ্ছে তাদের কাগজপত্রের বাহক। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সে পৌঁছে দেয় পাকিস্তানে। সেখান থেকে মেজর লতিফের নির্দেশ ও সেই সঙ্গে পয়সা-কাড়িও সে এনে দেয় তাদের। মাঝে মধ্যে সার্ভে সেকশনের হেড্কোয়ার্টার ঢাকার জরুরী নির্দেশও থাকে।

॥ এগারো ॥

১৯৬৫ সাল। পাকিস্তানে ফিরে যাবার নির্দেশ এল ছোট দিলীপের কাছে।

প্রথমটায় একটু হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল ছোট দিলীপ। হঠাৎ ফিরে যাবার নির্দেশ কেন? তা'হলে কি সে এমন কোন অপরাধ করেছে যার জন্যে কর্তৃপক্ষ তার বৈফিয়ত তলব করতে তাকে ফিরে যেতে বলেছে? সঠিক কারণ কিন্তু বড় দিলীপ ও স্বপনও অনুমান করতে পারে না। তারা আশ্বাস দেয় ছোট দিলীপকে। বলে, আগেই এত ভাবনা-চিন্তার কী আছে?

—চিন্তা-ভাবনা হবে না? বলতে থাকে ছোট দিলীপ, আমাকে দিনাজপুরের বদলে যশোহরে গিয়ে সার্ভে সেকশনের অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে বলেছে।

—তাই তো, দিনাজপুরের বদলে যশোহরে কেন? চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে স্বপন ও বড় দিলীপের চোখে মুখে।

অবশেষে অনেক পরামর্শের পরে ঠিক্‌ হলো ছোট দিলীপ যশোহরের বদলে প্রথমে যাবে দিনাজপুরে। সেখানে সার্ভে সেকশনের মেজর লতিফের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে তারপর সে যাবে যশোহর।

রওনা হবার আগের দিন ছোট দিলীপকে বিদায় জানালো স্বপন ও বড় দিলীপ। বড় দিলীপের রবীন্দ্রনগরের ভাড়া বাড়িতে নিমন্ত্রিত হলো সে। রান্নাবান্না করলো অনু। তার কৌতুহলী প্রশ্নের জবাবে একটা ঢোক গিলে বড় দিলীপ বললে, আমাদের কোম্পানী ওকে কোলকাতায় বদলী করেছে। সেখানেই যাচ্ছে।

অনু সহজেই বিশ্বাস করে স্বামীর কথা। কেবল জিজ্ঞেস করলে, এখানে ওঁর কাজ এখন কে করবে?

বড় দিলীপের বদলে জবাব দেয় স্বপন, কোম্পানী যতদিন আর একজন কাউকে না পাঠাচ্ছে ততদিন আমাদের নিজেদেরই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

ছোট দিলীপও বলে ওঠে, আর বলেন কেন বৌদি। সব কোম্পানীরই একই স্বভাব। কম লোক দিয়ে বেশি কাজ করানো।

অবশেষে এক শীতের সকালে বর্ডার পার হয়ে পাকিস্তানের

ঘাঁটি দিনাজপুরে এসে হাজির হলো ছোট দিলীপ। দুরু দুরু বক্ষে মেজর লাতিফের অফিসে তার সঙ্গে দেখা করতেই সে হেসে বললে, এই যে নুর, এসে পড়েছো। তা, এখানে কেন? তোমাকে তো যেতে বলেছে যশোহরে।

—হ্যাঁ স্যার, জানি। জবাব দেয় নুর ইসলাম, সেখানেই যাবো। তবে যাবার আগে একবার আপনাকে আদাব জানাতে এসেছি।

খুশি হয়ে ওঠে মেজর লতিফ। নিজের মিলিটারী গোঁফে চাড়া দিয়ে একটু হেসে বললে, ভালই করেছ। তা, কবে নাগাদ সেখানে রওনা হতে চাও?

এতক্ষণে মনের ধুকপুকানি খানিকটা কমে নুর ইসলামের। মেজর সাহেবের কথার মধ্যে এখন পর্যন্ত এমন কিছু সে পায়নি যাতে সে মনে করতে পারে তার তলব হয়েছে কোন কৈফিয়ত দেবার জন্যে। তবুও তার মনের সন্দেহ যায় না। তাই সে এবার সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে মেজর লতিফকে, কিন্তু স্যার, হঠাৎ এভাবে আমাকে শিলিগুড়ি থেকে ডেকে পাঠানো হলো কেন? আমার কাজের মধ্যে কি কোন গলতি—

নুর ইসলাম তার কথাটা শেষ করতে পারে না। তার আগেই মেজর লতিফ তীক্ষ্ণ চোখে তার মুখের ভাব লক্ষ্য করতে করতে হো হো করে হেসে উঠে বললে, তুমি বুঝি ভেবেছ কোন অপরাধের জন্যে তোমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে? আরে না—না, ব্যাপারটা ঠিক্ উল্টো। আর কতকাল বর্ডার পার হয়ে গোপন কাগজ-পত্র নিয়ে এমনি যাতায়াত করবে? কর্তারা তোমার কাজে খুব খুশি। এবার থেকে তোমাকে একা কাজ করতে হবে ঐ ফজলুর রহমান ও আব্দুল করিমের মত। তবে তার আগে তোমাকে ঢাকায় গিয়ে ট্রেনিং নিতে হবে। সেই জন্যেই প্রথমে যশোহরে তোমার ডাক পড়েছে।

মেজর লতিফের কথায় মনটা নেচে ওঠে নুর ইসলামের।

সে বেরিয়ে এলো মেজর লতিফের অফিস থেকে। এতদিনে বোধহয় আল্লাহ্‌তালার দোয়া লাভ করতে চলেছে সে। ঢাকায় গিয়ে ট্রেনিং নিতে হবে তাকে। গুপ্তচর বৃত্তির ট্রেনিং। হিন্দুস্তানের মাটিতে বসে কেমন করে খবরাখবর জোগাড় করতে হবে তারই নিয়ম-কানুন এবার শিখতে হবে। সেই খবরের উপর ভিত্তি

করেই গড়ে উঠবে পাকিস্তানের ফৌজি পরিকল্পনা। অবশেষে একদিন পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী কায়েদে আজমের নাম স্মরণ করে প্রচণ্ড আঘাত হানবে হিন্দুস্থানের ওপর। সেই আঘাতে টলমল করে উঠবে গোটা হিন্দুস্থান। এমনিভাবেই পাকিস্তান গ্রহণ করবে ১৯৬৫ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা। এই ঢাকা সহরের এক সামরিক ট্রেনিং সেণ্টারে গুপ্তচর বৃত্তির ট্রেনিং আরম্ভ হলো নূর ইসলামের। বেশ কড়া ধাঁচের ট্রেনিং। তবে এই ট্রেনিংয়ে বিদ্যার চাইতে বুদ্ধির প্রয়োজনই বেশি। সেই বুদ্ধি নূরের আছে।

বেশ ভালোভাবেই ট্রেনিং শেষ হলো নূরের। একদা দিনাজপুরের শালকরের দোকানের কর্মচারী নূর ইসলাম এখন একজন পাকা গুপ্তচর। গুপ্তচর বৃত্তির মারাত্মক খেলা খেলতে এখন সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

একদিন নূরের ডাক পড়লো ঢাকার সার্ভে সেকশনের বিগ্রেড হেড কোয়ার্টারে। স্বয়ং ব্রিগেডিয়ার সেলিম কথা বলতে চান নূরের সঙ্গে।

সেলিম সাহেবের চেম্বারে ঢোকার মুখে বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল নূরের। সোজা কথা তো নয়, পূর্ব পাকিস্তানের সার্ভে সেকশনের সর্বময় কর্তা এই সেলিম সাহেব। পশ্চিম পাকিস্তানের এই লোকটি চেহারা ও মেজাজ, দু'টোতেই খাঁটি মিলিটারী। ছ' ফুটের বেশি লম্বা, মাথায় টাক, কাঁচা-পাকা লম্বা গোঁফজোড়া ক্রীমের দৌলতে নাকের দু' পাশে সর্বদাই পাখনা মেলে থাকে। অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি দিয়ে তিনি যখন কারুর দিকে তাকান তখন তার বুকের মধ্যে শুরু হয়ে যায় ধুকপুকানি। বাঙ্গালী সম্পর্কে কোনদিনই কোন উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না তিনি। তাঁর মতে মিলিটারীতে বাঙ্গালীরা একেবারেই বে-মানান। এরা বড়জোর কেরানীর কাজ করতে পারে। তা'ছাড়া, সেলিম সাহেব বাঙালী মুসলমানদের খাঁটি মুসলমান বলে গণ্য করতেও রাজী নন।

পূর্ব পাকিস্তানের সার্ভে সেকশনের কর্মী হলেও নূর নিজে মিলিটারী নয়। সে সিভিলিয়ান। তাই, মেজর সেলিমের ঘরে ঢুকে মিলিটারী নিয়মের বদলে সাধারণভাবে যে নমস্কার জানায়

তাঁকে—সেলাম আলেকম্।

খাঁটি উর্দু উচ্চারণে প্রতিনমস্কার জানান ব্রিগেডিয়ার সেলিম—আলেকম সেলাম। তারপর সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ নূরের দিকে তাকিয়ে থেকে উর্দুতে বললেন, তোমার ট্রেনিংয়ের কাগজপত্র আমি পেয়েছি। ট্রেনিংয়ে তো ভালই করেছো। এবার আশা করবো আসল কর্মক্ষেত্রেও তুমি ভালো কাজ করতে পারবে। সেই আশা নিয়েই আমরা এবার তোমাকে বর্ডারের ওপারে পাঠাবো।

—সবই আল্লাহ্‌তালার মর্জি। ভাঙা উর্দুতে জবাব দেয় নূর।

—হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে নিজেকেও চেষ্টা করতে হয়।

—আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো, জনাব।

—খুব সাবধানে থাকবে। মনে রেখো, তুমি ধরা পড়লে একা তোমারই কেবল বিপদ নয়, এর ফলে পাকিস্তান সরকারকেও বিপদে পড়তে হবে।

—হ্যাঁ, জনাব, জানি।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই ব্রিগেড়িয়ার সেলিম কণ্ঠস্বর একটু নীচু করে আবার জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, তুমি শাদী করেছ?

লজ্জিত ভঙ্গিতে জবাব দেয় নূর, না জনাব।

একটু সময় কি যেন চিন্তা করেন ব্রিগেডিয়ার সেলিম। তারপর অপেক্ষাকৃত হালকা সুরে বললেন, চট্‌পট্‌ একটা শাদী করে ফেল।

—শাদী?

—হ্যাঁ, শাদী। বয়স তো হয়েছে তোমার। এখন শাদী করতে আপত্তি কি? তোমাকে যে কাজ করতে হবে তাতে শাদী করা থাকলে সুবিধে হয়। একা থাকলে অনেকে অনেকরকম সন্দেহ করে, কিন্তু শাদী করে আওরৎ নিয়ে বাস করলে সাহসা কেউ সন্দেহ করে না। তার ওপর, মুসলিম জেনানার বদলে হিন্দু জেনানা নিয়ে ঘর করলে তো সন্দেহ আরও কম্।

সেলিম সাহেবের কথায় বড় দিলীপ অর্থাৎ ফজলুর রহমানের কথা মনে পড়েছিল নূরের। এই জন্যেই কি ফজলুর হিন্দু মেয়ে অনুভাকে বিয়ে করেছিল?

ব্রিগেড়িয়ার সেলিম এরপরে টেবিলের ওপর থেকে একটা টাইপ করা কাগজ তুলে নিয়ে চোখে বুলোতে থাকেন। তারপর আবার

বললেন, শোনে নূর, এবারে প্রথমে তোমাকে পাঠান হবে ত্রিপুরায়। ইণ্ডিয়ান আর্মির একটা বড় ঘাঁটি রয়েছে ত্রিপুরার আগরতলায়। ঐ ঘাঁটির খবরাখবর জোগাড় করতে হবে তোমাকে। এখান থেকে অর্ডার নিয়ে তুমি সোজা চলে যাবে কুমিল্লায়। সেখানে রয়েছে আমাদের জোন্যাল ব্রাঞ্চ। সেখানে গিয়ে তুমি রিপোর্ট করবে এবং এখান থেকে পরবর্তী আদেশের প্রতিক্ষা করবে।

ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে নূর। ট্রেনিং শেষে তাকে কোথায় পাঠানো হবে তা নিয়ে চিন্তিত ছিল সে। তা ছাড়া, কুমিল্লায় গেলে তার সুবিধেই হবে। ঐ জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তার এক নিকট আত্মীয় থাকে। পাকিস্তানের মাটি ছেড়ে হিন্দুস্থানের মাটিতে পা দেওয়ার আগে পর্যন্ত সে অনায়াসেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকতে পারবে। কিন্তু বিয়ে করা সম্পর্কে সেলিম সাহেবের সেই উপদেশের ব্যাপারে সে কী করবে?

বাস্তবিক, নিজের বিয়ের কথা এতকাল সে চিন্তার মধ্যেই আনে নি। সে সুযোগও তার ছিল না। পাকাপাকি সরকারী কোন চাকরি নয়, কেবল কিছু অর্থের বিনিময়ে বর্ডার পার হয়ে গোপন কাগজপত্র ওপার থেকে এপার নিয়ে এসে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া। এতকাল এই করেই সে কাটিয়েছে। এ অবস্থায় বিয়ের কথা সে চিন্তাও করেনি। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সেলিমের সেই উপদেশের পর থেকে মাঝে মাঝেই এই চিন্তায় পেয়ে বসে তাকে। একটি ছোট সংসার—একজন প্রেমময়ী স্ত্রী যাকে নাকি সে একান্ত আপন বলে ভাবতে পারবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সেই আত্মীয়ের বাড়ি থাকতে তেমনি একটি মুসলিম ঘেঁসা হিন্দু যুবতী অনিতা দাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো নূর ইসলামের। নূরের সেই আত্মীয়ের পাশের বাড়িটিই ছিল অনিতাদের। নিম্নমধ্যবিত্ত না বলে দরিদ্রই বলা উচিত। অনিতার চাল-চলন আদব-কায়দা প্রায় মুসলিম মেয়েদের মতই। আক্ষেপসূচক ভাব প্রকাশ করতে "হায় ভগবান" না বলে "হায় আল্লা" বলে ফেলে অনিতা। নিম্নবিত্ত মুসলিম মেয়েদের মত কাঁচের চুড়িই তার পছন্দ।

অনিতা প্রায়ই নূরের আত্মীয় বাড়ির মেয়েদের কাছে এসে

গল্পগুজব করতো। সেই সূত্রেই তার পরিচয় ঘটলো নূরের সঙ্গে
অবশেষে একদিন বিয়ের প্রস্তাব হতেই অনিতার মা-বাবা
কাছ থেকে কোন আপত্তি তো উঠলোই না, বরঞ্চ খুশিই হলো তারা

না, আর একা নয়। নূর এবার স্ত্রী অনিতাকে সঙ্গে নিয়েই
আগরতলা যাবে। তবে নতুন বৌ, তাই একজন সঙ্গী চাই
তার। ঠিক হলো অনিতার ছোট বোন পুষ্প যাবে তাদে
সঙ্গে। বারো বছর বয়সের বালিকা পুষ্প খুবই বুদ্ধিমতী। কথা
বার্তার মধ্য দিয়ে সে এটুকু বুঝে নিয়েছিল যে তার জামাইবা
বর্ডারের ওপারে যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে চলেছে সেই কা
কেবল গোপনই নয়, বিপদজনকও বটে। তাই জামাইবাবুর সঙ্গে
সঙ্গে তাকে এবং তার দিদিকেও সাবধানে থাকতে হবে সেখানে।

আগরতলা সহরের বাইরে সেখানকার এয়ারড্রোম। আর এ
এয়ারড্রোমের প্রায় সঙ্গেই কুমিল্লা জেলার আখাউড়া রেল স্টেশন
কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ভারতের আগরতল
যাওয়া কোন সমস্যাই নয়।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরে আগরতলার ধলেশ্বরে একটা বাস
পাওয়া গেল। নূর ইসলাম তার স্ত্রী অনিতা ও শ্যালিক
পুষ্পকে নিয়ে এসে উঠলো সেই বাসায়। আগরতলায় পূ
পাকিস্তান ছেড়ে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুর ভিড়। তাদের ভেতর
একটা বড় অংশই এসেছে বর্ডারের ওপার অর্থাৎ কুমিল্লা জেল
থেকে। কথায় তাদের কুমিল্লার টান। কাজেই ঝাঁকের বৈ
ঝাঁকে মিশে যাবার মত খাঁটি কুমিল্লার মেয়ে অনিতা ও পুষ্পর
পক্ষে উদ্বাস্তুদের দলে মিশে যেতে কোন বাধা রইলো না
নূর ইসলামও মিশে গেল তাদের সঙ্গে উদ্বাস্তুর ভেক ধরে
এখানে এসেও সে গ্রহণ করলো তার সেই পুরানো হিন্দু নাম—
দিলীপ দে।

হিন্দুস্থানের মাটিতে এসে জাঁকিয়ে তো বসলো, এবার কাজের
দিকে মন দিতে হবে। প্রথমেই তৈরি করতে হবে এজেন্ট। ভারতীয়
সৈন্যবাহিনার বিভীষণদের মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে তাদের
সেই বিভীষণদের মারফত জোগাড় করতে হবে ভারতীয় সেনা-
বাহিনীর গোপন খবর, সংগ্রহ করতে হবে গোপন দলিলপত্র।

বেশ কিছুদিন এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করেও এজেন্ট তৈরী

করার মত উপযুক্ত লোকের খোঁজ পেল না নূর। আগরতলায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ছাউনী এলাকায় ঘোরাফেরা করলো, সহরের যে সব এলাকায় সৈন্যবাহিনীর কর্মীরা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে বাস করে সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করলো, কিন্তু সবই বৃথা। অবশেষে হঠাৎ একদিন তার মনে পড়লো শিলিগুড়ি থাকতে যাদব দেববর্মা নামে একজন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার। এই লোকটি থাকতো শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাবার রাস্তায় শুক্না নামে একটা এলাকায়। সেই শুক্নাতে ছিল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর একটা ছাউনী। যাদব দেববর্মা ছিল সেখানকার কর্মচারী। আব্দুল করিম ওরফে স্বপন চৌধুরীর এজেন্ট ছিল ঐ যাদব দেববর্মা। সেই সূত্রেই তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল নূরের।

শিলিগুড়ি থাকতে একদিন কথায় কথায় যাদব বলেছিল যে তার স্ত্রী নাকি আগরতলা থাকে। যাদব ছুটি ছাটায় যায় তার স্ত্রীর কাছে। কথাটা এখন মনে পড়তেই নূর খোঁজ করতে শুরু করলে যাদব দেববর্মার স্ত্রী গায়ত্রীর।

আগরতলার মত একটা জনবহুল সহরে কেবলমাত্র নামের সাহায্যে কাউকে খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত। নূর যখন বুঝতে পারলে এভাবে হবে না, তখন সে শরণাপন্ন হলো সেখানকার সৈন্যবাহিনীর হেড্‌কোয়ার্টারের।

একদিন নূর সরাসরি সেই হেড্‌কোয়ার্টারে গিয়ে সেখানকার একজন অফিসারকে বললে, একজন লোকের খোঁজে আপনাদের সাহায্য চাইতে এসেছি।

অফিসারটি পাঞ্জাবী। নূরের আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, কে সেই লোক? কী নাম তার?

—যাদব দেববর্মা। জবাব দেয় নূর।

—কোন্ ইউনিট?

একটু সময় চুপ করে থেকে নূর জবাব দেয়, এখানে নয়। সে থাকে দার্জিলিং জেলার শুকনাতে।

—তা, এখানে তার কী খবর চাইছেন?

—তার স্ত্রী গায়ত্রী দেববর্মা থাকে এই আগরতলায়। কিন্তু

তার ঠিকানা আমি জানি না। তাই এসেছি আপনাদের কাছে, যদি আপনারা আমাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারেন।

খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করে সেই পাঞ্জাবী অফিসার। তারপর বললে, সেনাবিভাগের কর্মীদের পরিবার-পরিজন যারা এই সহরে থাকে তাদের মোটামুটি খবর আমাদের এখানে আছে। তবে, তার আগে বলুন আপনি কে?

বিনীত ভঙ্গীতে জবাব দেয় নূর, আমার নাম দিলীপ দে। পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছি। থাকি ধলেশ্বরে। যাদব দেববর্মার স্ত্রী গায়ত্রী দেববর্মা আমার পরিচিত। তার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

অফিসারটি আবার কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থাকে নূরের দিকে। তারপর কিছু কাগজপত্র ঘেঁটে একটা ঠিকানা বের করে হাসিমুখে বললে, হ্যাঁ পেয়েছি। শ্রীমতী গায়ত্রী দেববর্মা, ওয়াইফ অব যাদব দেববর্মা, শুকনা ইউনিট—

গায়ত্রীর ঠিকানা নিয়ে পাঞ্জাবী অফিসারটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে নূর। যাক্, এতদিনে যোগাড় হলো ঠিকানা। এখন সময়-সুযোগ মত একদিন গিয়ে হাজির হতে হবে সেখানে।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে এসে দাঁড়ায় গায়ত্রী। হাতে তার হলুদের ছোপ, বোধহয় রান্না করছিল সে।

নূরের মুখের দিকে তাকিয়ে কৌতূহলী কণ্ঠে গায়ত্রী জিজ্ঞেস করে, কাকে চাই?

একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে জবাব দেয় নূর, আমি এসেছি গায়ত্রী দেববর্মার সঙ্গে দেখা করতে।

—আমিই গায়ত্রী, বলতে থাকে গায়ত্রী, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক্—

—চিনতে পারছেন না, তাই তো? বলে ওঠে নূর, আপনার পক্ষে আমাকে তো ঠিক চিনবার কথা নয়, কারণ আমাকে আপনি আগে কখনও দেখেন নি।

গায়ত্রী আর কিছু না বলে কেবল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলতে থাকে নূর, আমার নাম দিলীপ দে। এখন ধলেশ্বরে থাকি। আপনার স্বামী যাদববাবু বোধহয়

এখনও শুক্‌নায় আছেন। আমি যখন শিলিগুড়ি থাকতাম তখন সেখানে আপনার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম আপনি নাকি এখানে থাকেন। তাই এলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

স্বামীর প্রসঙ্গে মনটা খুশি হয়ে ওঠে গায়ত্রীর যত্ন করে নূরকে এনে বসায় নিজের বাইরের ঘরে। চা-বিস্কুট এনে আপ্যায়ন করে। তারপর নিজের প্রসঙ্গ ছাড়াও নূরের পারিবারিক প্রসঙ্গ নিয়েও কথা বলতে থাকে তার সঙ্গে। নূরও খুব সতর্কতার সঙ্গে জবাব দিতে থাকে তার প্রশ্নের।

অবশেষে একসময় নূর বললে, এবার তা'হলে উঠি, বৌদি। শিগ্‌গিরই বোধহয় দেখা হবে যাদববাবুর সঙ্গে। কিছু বলতে হবে নাকি তাকে ?

—কোথায় দেখা হবে ? কৌতূহলী প্রশ্ন গায়ত্রীর।

জবাব দেয় নূর, শুক্‌নায়। নিজের ব্যবসায়ের কাজে আমাকে একবার যেতে হবে ওখানে। কিছু বলার থাকে তো আমাকে বলে দিতে পারেন।

নূরের কথায় সহসা কোন জবাব দেয় না গায়ত্রী। স্বামী রয়েছে দূরে। সেই দূরের স্বামীর কাছে স্ত্রীর বলার কথার কি শেষ আছে ?

গায়ের আঁচলটা একটু টেনে দিয়ে কপালের ওপর ঝুঁকে পড়া চুলের গোছাকে আলতো হাতে পেছনে সরিয়ে দিতে দিতে গায়ত্রী অনুযোগের সুরে বলতে থাকে, দেখুন তো লোকটির কাণ্ড! মাসের মাঝামাঝি প্রায় এসে গেল, এখনও টাকার দেখা নেই। আমি এখানে ছেলেপুলে নিয়ে সংসার চালাই কেমন করে, বলুন তো ? পর পর দু'খানা চিঠি দিয়েছি, তারও কোন জবাব নেই। কিছু মনে করবেন না, আপনারা পুরুষেরা বড়ই স্বার্থপর। বাইরে থাকলে আপনাদের ঘরের কথা মনে থাকে না। উনি তো সেখানে দিব্বি আছেন, মেসে খাচ্ছেন-দাচ্ছেন। আমাদের এখানে চলে কি করে বলুন তো ?

কথার শুরুতে যা ছিল অনুযোগ, শেষের দিকে তার সঙ্গে জড়িয়ে গেল অভিমান। মনের ভাব লুকোতে মাথা নীচু করে গায়ত্রী।

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অভিমান। এর মধ্যে বাইরের লোকের

মাথা না গলানোই ভালো। তবুও যাদব দেববর্মার স্বপক্ষে বলতে গিয়ে বলে ওঠে নূর, বোধহয় কোনরকম অসুবিধা ঘটেছে, তাই ঠিকমত খবর নিতে পারছেন না। তা'ছাড়া, পোস্টাপিসের যা হাল তাতে সময়মত মানি অর্ডারও পৌঁছয় না।

—তা'হলে মাসে একবার অন্ততঃ নিজের আসা উচিত। কতই বা সময় লাগে?

নূর একটু হেসে বললে, অন্যের চাকরি করে কি সবসময় নিজের ইচ্ছে মত চলা যায়? বিশেষ করে মিলিটারী চাকরিতে কড়াকড়ি তো বেশি থাকবেই। ঠিক্ আছে, আপনি ভাববেন না। আমি দু'এক দিনের মধ্যেই সেখানে যাবো। যদি ইতিমধ্যে যাদববাবু টাকা মানি অর্ডারে না পাঠিয়ে থাকেন তা'হলে আমিই টাকা সঙ্গে করে নিয়ে এসে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো। আপনি বরঞ্চ সেইভাবে আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে দিন।

নূরের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত মনে হতেই গায়ত্রীর মনটা খুশি হয়ে ওঠে। ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে সে বললে, ভালই হয়েছে, আপনি একটু বসুন। আমি দু'কলম লিখে নিয়ে আসছি।

একটু পরে গায়ত্রী ঘরে ঢুকে একখানা ভাঁজকরা কাগজ নূরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, এই নিন চিঠি। আর—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় গায়ত্রী।

—আর কি বলুন? জিজ্ঞেস করে নূর।

গায়ত্রী একটা ঢোক গিলে বললে, জানেন, ও আমসত্ব খেতে খুব ভালোবাসে। বাড়ি আসবে বলে আমসত্ব আনিয়ে রেখেছিলাম। তাই বলছিলাম আপনি যদি দয়া করে খানিকটা আমসত্ব ওর জন্যে নিয়ে যান—

—আরে, একথা বলতে এত ইতস্ততঃ করছেন কেন? বোনের জন্যে ভাই এই সাধারণ কাজটুকু করতে পারবে না? দিন—দিন, আমসত্ব এনে দিন। আমি নিশ্চয়ই যাদববাবুকে পৌঁছে দেব।

স্ত্রীর চিঠি ও আমসত্ব পেয়ে শুকনায় যাদব দেববর্মা তো খুব খুশি। নূরকে জিজ্ঞেস করে, আপনি এখন আর শিলিগুড়ি থাকেন না?

জবাব দেয় নূর, না, এখন আগরতলায় থেকে কাজ করছি।

—ঐ কাজই তো? চোখের ইশারা করে যাদব।

সলজ্জ হাসি হেসে কেবল মাথা নাড়ে নূর।

—তা'হলে শিলিগুড়ির স্বপনবাবু ও বড় দিলীপবাবুর কাছ থেকে আলাদা হয়ে আপনি এখন কাজ করছেন ?

—হ্যাঁ, কর্তাদের নির্দেশ তাই।

—ও'দের সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই আপনার ?

—ছিল না। তবে, আজই আবার হয়েছে। এখানে আসার পথে স্বপনবাবু ও বড় দিলীপবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসেছি।

—আপনি কবে আগরতলায় ফিরছেন ?

—কালই ফিরবো।

—টাকাটা যখন মানিঅর্ডার করতে পারিনি তখন আপনার হাতেই দিয়ে দিচ্ছি। আপনি আমার স্ত্রীকে দেবেন। আর সেই সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের জন্যে কয়েকটা উলের সোয়েটারও আপনাকে দেব। অসুবিধা না হলে দয়া করে পৌঁছে দেবেন।

—না-না, কোন অসুবিধা হবে না আমার। আপনি দিন।

গুপ্তচর বৃত্তিতে এজেন্ট তৈরির কাজ খুব সহজ নয়। ধৈর্য ধরে ধীরে ধীরে এগোতে হয়। নূরের লক্ষ্য যাদব দেববর্মা। শিলিগুড়ির আব্দুল করিম ওরফে স্বপন চৌধুরীর এজেন্টদের মধ্যে এই যাবদ দেববর্মা যে খুব দামী এজেন্ট তা' শিলিগুড়ি থাকতেই টের পেয়েছিল নূর। তাই এবার তার নজর পড়লো ঐ যাদবের দিকে। স্বপনের বদলে সে যদি যাদবকে নিজের এজেন্ট করতে পারে তা'হলে সে একটা কাজের মত কাজ করে ফেলতে পারবে। গুপ্তচরবৃত্তিতে এজেন্ট নিয়ে টানাটানি নতুন কিছু নয়।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই নূর ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো গায়ত্রী ও যাদব দেববর্মার। জিনিসপত্র, পয়সা-কড়ি সে দেয়া-নেয়া করে এই স্বামী-স্ত্রী যুগলের মধ্যে। আগরতলায় গায়ত্রী দেববর্মার প্রায় ঘরের লোক হয়ে উঠলো নুর ইসলাম। শুকনায় যাদবেরও বিশ্বাসভাজন। অবশেষে একদিন সুযোগ বুঝে সে কথাটা পাড়লো যাদবের কাছে। বললে, শুনতে পাই শিলিগুড়ির স্বপনবাবুর বাড়বাড়ন্ত নাকি আপনারই সাহায্যে। দামী দামী দলিলপত্র নাকি আপনি তুলে দেন তার হাতে। আপনার সাহায্যের ছিঁটেফোঁটাও যদি আমি পেতাম তা'হলে বর্তে যেতাম।

নুরের এই ইঙ্গিত না বোঝার মত বোকা নয় যাদব দেববর্মা। একট ভেবে সে জবাব দেয়, স্বপনবাবুর সঙ্গে আমার একটা

মৌখিক চুক্তি রয়েছে যে একমাত্র তার হয়েই আমি কাজ করবো।

ম্লান কণ্ঠে নূর আবার বললে, বুঝতে পারছি না আপনার মত একজন লোক কেন চিরকাল একজনের কাছে বাঁধা থাকবেন।

—না-না, বাঁধাবাঁধির কিছু নয়, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে যাদব, অনেকদিন ধরে ওর সঙ্গে কাজ করছি—

—বেশ তো, এবার না হয় আমার সঙ্গে কিছু করলেন।

কোন জবাব না দিয়ে চুপ্ করে থাকে যাদব দেববর্মা। এ ধরনের বিপদজনক কাজকারবার একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আবার নূর ওরফে ছোট দিলীপকে নারাজ করতেও মন সরে না। তাই, অবশেষে সে বললে, ঠিক আছে, একটু ভেবে দেখি।

গোপন কথা যতই গোপন হোক্ না কেন সময় সময় তা প্রকাশ হয়ে পড়ে মানুষের মত বাতাসেরও বোধহয় কান আছে। বাতাসে ভর করেই একদিন কথাটা এসে পৌঁছে গেল শিলিগুড়িতে। শুনে, আব্দুল করিম ওরফে স্বপন চৌধুরী খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে রইলো। সে এ ধরনের এজেন্ট-ভাঙ্গানী অন্তত নূর ইসলামের কাছ থেকে আশা করে নি।

দার্জিলিং জেলার শুক্‌না থেকে আগরতলা যেতে শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগরের বাসায় বড়দিলীপ ও স্বপনের সঙ্গে একদিন দেখা করতে এলো নূর।

বড়দিলীপ বাড়ি ছিল না। অনুভার সঙ্গে দেখা করে নূর স্বপনের ঘরে আসতেই স্বপন গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কেমন আছো?

স্বপনের কথার ঢংয়ে একটু বিস্ময় বোধ করে নূর। স্বপন বরাবর বেশ সোরগোল করেই তাকে অভ্যর্থনা করে এসেছে। আজ হঠাৎ এমন গম্ভীর কেন?

স্বপনের ঘরে খাটের ওপর বসতে বসতে জবাব দেয় নূর, ভালই আছি, ভাইজান। আপনারা কেমন আছেন?

স্বপনের আগমন টের পেয়ে এইসময় ঐ বাড়ির বাসিন্দা স্বপনের বিশ্বস্ত এজেন্ট মনোরঞ্জনও এসে হাজির হয় সেখানে।

নূরের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে স্বপন তেমনি কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করে, শুকনা থেকে ফিরলে নাকি?

শুক্‌নার প্রসঙ্গে চমকে ওঠে নূর। একটা ঢোক গিলে জবাব দেয়,

না, সেখানে যাইনি এখনও।

—যাবে নিশ্চয়ই, উষ্মা প্রকাশ পায় স্বপনের কণ্ঠে, তা, এজেন্ট ভাঙানীর ট্রেনিং কোথায় পেয়েছ? ঢাকায়? সেখানকার পাকিস্তানী কর্ত্তারা কি তোমাকে এই ট্রেনিংও দিয়েছে?

এতক্ষণে থলি থেকে বেড়াল বের হয়ে পড়েছে। আর কিছুই অস্পষ্ট নেই। স্বপনের এই প্রশ্নের কি জবাব দেবে নূর? কোন জবাবই তো দেবার নেই তার। তাই সে মাথা নীচু করে অপরাধীর ভঙ্গিতে চুপ্ করে থাকে।

এই সময় বলে ওঠে মনোরঞ্জন, এটা কিন্তু বাস্তবিকই ঘোরতর অন্যায়, ছোটদিলীপবাবু। ক্ষমতা থাকে নিজে এজেন্ট তৈরি করুন। তা' নয়, অন্যের এজেন্টের পেছনে লেগেছেন।

আর চুপ্ করে থাকা চলে না। কিছু একটা জবাব দিতে হয়। নূর জবাব দেবার জন্যে মুখ তুলতেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে স্বপন চৌধুরী, আমি আজই ঢাকায় এসব কাণ্ডকারখানার কথা জানাবো। সার্ভে সেকশনের ব্রিগেডিয়ার সেলিম সাহেবকে সোজা জানিয়ে দেব এধরনের কাজকর্ম চললে ব্যক্তিগত ক্ষতির চাইতে পাকিস্তানেরই বেশি ক্ষতি হবে। দেখা যাক্, উনি কী জবাব দেন।

স্বপনের কথায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে নূর। এই কথা জানতে পারলে ক্ষেপে উঠবেন ব্রিগেডিয়ার সেলিম। চাই কি তাকে ফিরিয়েও নিয়ে যেতে পারেন পাকিস্তানে। সেক্ষেত্রে ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে নূরকে।

সাহসা উঠে দাঁড়ায় নূর। তারপর স্বপনের কাছে ছুটে গিয়ে তার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে অনুশোচনার সুরে বলতে থাকে, আমাকে মাপ করুন, ভাইজান। জীবনে এই প্রথম একা কাজ করতে নেমে একজন ভালো এজেন্ট জোগাড় করার মতলবে একাজ করেছিলাম। ছোট ভাইয়ের অপরাধ মাপ করুন, ভাইজান। আল্লার কসম্, এমন কাজে আর কোনদিন হাত দেব না। ঢাকায় জানাবেন না এ খবর। বৌ নিয়ে পাকিস্তানে ফিরে যেতে হলে না খেয়ে মরতে হবে সেখানে। লেখাপড়া শিখিনি। অন্য কোন কাজকর্মও জানি না। এই কাজ ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই, ভাইজান।

নূরের কথায় আব্দুল করিম ওরফে স্বপন চৌধুরীর মনটা নরম

হয়ে ওঠে। নূরের মুঠো থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটিয়ে নূরকে আবার বললে, যাদব দেববর্মার মত এজেন্টকে চেষ্টা করেও ভাঙাতে পারবে না তুমি। কেবল যাদব কেন আমার কোন এজেন্টের কাছেই তুমি ঘেঁষতে পারবে না। তেমন বিশ্বাসঘাতক নেমকহারাম এজেন্ট আমার নয়।

কথাটা শেষ করেই স্বপন দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে গর্বভরে তাকায় মনোরঞ্জনের দিকে। মনোরঞ্জনের মুখেও দেখা দেয় পরিতৃপ্তির হাসি।

ঠিকই বলেছে স্বপন। যাদব দেববর্মা কিম্বা মনোরঞ্জন সরকারের মত পাকিস্তানের ভারতীয় এজেন্টরা নেমকহারামী কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা কাকে বলে জানে না। তারা যা জানে তার নাম দেশদ্রোহীতা। নিজের দেশের গোপন খবর অন্য দেশকে বিকিয়ে দেয়াটাকে তারা বোধহয় অপরাধ বলেই মনে করে না।

॥ বারো ॥

শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগরের ভাড়াবাড়িতে নতুন সংসার পেতে ভালই দিন কাটছে অনুভার। স্বামী-স্ত্রীর ছোট সংসার। কোন ঝামেলা নেই। পেটে তার বড় দিলীপের সন্তান। সংসারের কাজের পরে তার হাতে অফুরন্ত সময়। এই সময়টা অনুভা কাটায় অন্য ভাড়াটেদের ছেলে-মেয়ে সামলে কিম্বা তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে। মাঝে মধ্যে তার নিজের ঘরেও আড্ডা বসে। সেই আড্ডায় যোগ দেয় স্বপন, মনোরঞ্জন এবং প্রসন্ন। অনুভা লক্ষ্য করে স্বপন যদিও তার স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু ঐ প্রসন্নর সঙ্গেই যেন তার স্বামী বড় দিলীপের ঘনিষ্ঠতা বেশি। প্রসন্ন প্রায়ই আসে বড় দিলীপের কাছে। মুখোমুখি বসে কথা বলে তারা।

প্রসন্নকে বড়ই ভাল লাগে অনুভার। বেশ সপ্রতিভ ছেলে। অল্প বয়স। ‘বৌদি’ বলে ডাকে তাকে। মাঝে মাঝে এটা-ওটা খেতে

চায় বোদির কাছে। অনুও বিমুখ করে না তাকে। স্বপনও কিন্তু অনুকে 'বৌদি' বলেই ডাকে। তবে তার বয়স বেশি। তাই অনু স্বপনের কাছে ততটা নিঃসঙ্কোচ হতে পারে না যতটা পারে প্রসন্নর কাছে।

অল্প বয়সী প্রসন্ন অবিবাহিত। সে থাকে ব্যাংডুবির এম. ই. এস্ কোয়ার্টারে। খাওয়া-দাওয়া করে সেখানকার মেসে। তাই সুযোগ পেলেই সে এসে উপস্থিত হয় শিলিগুড়িতে বড় দিলীপের বাসায়।

কৌতূহল বস্তুটি অনুভার বরাবরই কম। বিশেষ করে স্বামীর কাজকর্ম সম্পর্কে কোন কৌতূহলই তার ছিল না। সে জানে বড় দিলীপ কলকাতার এমন একটা কোম্পানীতে চাকরি করে যাদের ব্যবসা আলতা, সিঁদুর, চিরুনী নিয়ে। স্বপনও ঐ কোম্পানীর কর্মী।

তবে অনুর মত সবার কৌতূহল তো কম নয়। সমবয়সী ভাড়াটে বৌ-মেয়েদের মধ্যে অনুর ঘনিষ্ঠ কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করে, কী ধরনের চাকরি করে তোর বর? সারাদিন তো বাড়িতেই থাকে।

সলজ্জ হেসে ঠোঁট উল্টে জবাব দেয় অনু, কে জানে বাপু! তা ভাই, অতশত খবরে আমারই দরকার কি? যখন যা দরকার এনে দেয়, ব্যস্। পুরুষ মানুষের কাজকর্মের ব্যাপারে মাথা গলাতে আমার একদম ভালো লাগে না।

—পুরুষ মানুষকে এতটা বিশ্বাস করতে নেই। মুখটিপে হেসে হয়তো অন্য বধূটি বলে।

কৃত্রিম চোখ পাকিয়ে জবাব দেয় অনু, তা ভাই, আমিও জানি। সে ব্যাপারে কিন্তু খুব হুঁশিয়ার আমি! মনে করিস না চুপ করে থাকি বলে আমি একটা আস্ত বোকা। তবে এতদিন তো তোরাও দেখছিস। তেমন কিছু লক্ষ্য করেছিস কি?

অন্য বধূটি কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হয় এই ব্যাপারে বড় দিলীপ সত্যিই সৎ। ভাড়াটে বাড়ির অন্য মেয়েরা সামনে পড়লে মাথা নীচু করে করে চলে যেতেই সে অভ্যস্ত।

সন্ধ্যা হয় নি তখনও। ঘরের মধ্যে মুখোমুখি বসে মৃদু কণ্ঠে কথা বলছিল বড় দিলীপ ও প্রসন্ন। একটু আগেই প্রসন্ন

পাঁপড় ভাজা ও মুড়ি খাওয়ার বায়না ধরেছিল বৌদির কাছে।

রান্নাঘর থেকে খাবারের বাটি হাতে অনু বেরিয়ে এসে তাদের কাছে দাঁড়াতেই হঠাৎ আলোচনা বন্ধ হলো তাদের। কিন্তু তার আগেই অনুর চোখে পড়লো প্রসন্ন বড় দিলীপের হাত থেকে এক গোছা নোট নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের পকেটে রেখে দিলে।

বড় দিলীপ টাকা দিয়েছে প্রসন্নকে। এর আগেও এমনি টাকা দিতে সে দেখেছে তার স্বামীকে। সেদিন প্রসন্নর সঙ্গে আরও একটি লোক এসেছিল। অবাঙালী। সেদিন তারা চলে যাবার পরে অনু বড় দিলীপের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল সেই অবাঙ্গালী লোকটির নাম কৃষ্ণপ্রসাদ সিং। সেদিন তাদের টাকা দেবার কথা জিজ্ঞেস করতেই বড় দিলীপ হেসে হাল্কা সুরে জবাব দিয়েছিল, কোম্পানীর হয়ে ব্যবসা করি। পয়সা-কড়ির লেন-দেন তো হবেই।

সেদিন ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে নি অনু। দেখলে বুঝতে পারতো কোম্পানীর হয়ে ব্যবসা করলে তার স্বামী এমনি ভাবে তাদের পয়সাকড়ি দেবে কেন? বরঞ্চ উল্টে তারাই তাকে জিনিসপত্রের দাম দেবে।

ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত হয়েই আবার স্বাভাবিক হলো অনুর। মুড়ির বাটি প্রসন্নর হাতে দিতে দিতে স্বাভাবিক কণ্ঠে সে বললে, এই যে নিন ঠাকুরপো। তা, এর পরেই তো আবার চা খেতে চাইবেন। তাই চায়ের জল আগেই চাপিয়েছি।

একমুঠো মুড়ি মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে প্রসন্ন হাসিমুখে বললে, বা চমৎকার! এই না হলে কিসের বৌদি! দাদা আমাদের বাস্তবিকই ভাগ্যবান।

বড় দিলীপ কোন কথা না বলে স্মিত মুখে অনুর দিকে তাকায়। সলজ্জ ভঙ্গিতে সেখান থেকে সরে পড়ে অনু।

কৌতূহল বড় অদ্ভুত। একবার শুরু হলে পরিণতি না দেখে তৃপ্ত হয় না। প্রসন্নর সঙ্গে বড় দিলীপের এই পয়সা কড়ি লেন-দেনের ব্যাপারটা সেদিনের মত চাপা পড়লেও বরাবর কিন্তু চাপা রইলো না। আরও বেশি কৌতূহলী হয়ে ওঠে অনু। কেন তার স্বামী এমনি ভাবে মাঝে মাঝেই নোটের বাণ্ডিল তুলে দেয় ওদের হাতে? সত্যিই কি এসব ব্যবসার লেন-দেন, না অন্য কিছু? তা'ছাড়া তার স্বামীর কাছে এত টাকা পয়সাই বা আসে কোত্থেকে? কে

দেয়? কেন দেয়?

মনের একটা খটকা। সামান্য একটা সন্দেহ। সেই সন্দেহকে ঘিরে রহস্যজাল। এতদিন বড় দিলীপের যে আচরণকে স্বাভাবিক বলে মনে হতো, এখন যেন তা'অন্য কোন অর্থ বহন করে বলে মনে হয় অনুর। তাদের স্টীলের আলমারির চাবি থাকে অনুর আঁচলে, কিন্তু ঐ আলমারির একটা ড্রয়ারের চাবি রেখে দিয়েছে বড় দিলীপ নিজের কাছে। জিজ্ঞেস করতেই বড় দিলীপ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, ওর মধ্যে কোম্পানীর দরকারী কাগজ-পত্র আছে। এটাকে এতদিন স্বাভাবিক বলে মনে হলেও ইদানীং যেন তার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হতে বসেছ অনুর কাছে। অবশ্যি সে জানে ঐ ড্রয়ারের মধ্যে বাস্তবিকই কিছু কাগজপত্র থাকে কয়েকবার সে তা' দেখেছেও। বড় দিলীপ নিজের হাতে তা রাখে, আবার বের করে নিয়েও যায়। কিন্তু কেবল কি কাগজ পত্রই? তাছাড়া অন্যকিছু যে নেই তা কি জোর করে বলতে পারে অনু?

না, অনু তা পারে না। অবশেষে তার সন্দেহ দৃঢ় হয় যে আলমারীর সেই ড্রয়ারে কাগজপত্র ছাড়াও অন্য কিছু আছে। কিন্তু কী সেই অন্যকিছু?—তবে কি—তবে কি—।

অনুভার পক্ষে এমন সন্দেহ অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে এই শিলিগুড়ি সহরটি যেখানে ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে চোরাকারবারীর স্বর্গরাজ্য সেখানে কোম্পানীর চাকরির সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামী যদি কোন কিছু চোরাচালানের ব্যবসা করে তবে তা' কি খুবই অস্বাভাবিক? এই সূত্রেই বোধহয় মোটা টাকার লেনদেন। অবশেষে একদিন আর থাকতে না পেরে সে জিজ্ঞেস করেই বসে বড় দিলীপকে। বলে, আচ্ছা, আলমারীর ঐ ড্রয়ারের মধ্যে এমন কি দরকারী কাগজপত্র আছে যা নিয়ে তুমি আমাকেও বিশ্বাস করতে পারো না?

কথাটা শুনেই চমকে ওঠে বড় দিলীপ। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে পাকা অভিনেতার মত মুখের ওপর স্বাভা-বিকতার ভাব ফুটিয়ে তুলে জবাব দেয়, কে বললে যে তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না?

—বিশ্বাসই যদি করবে তা'হলে একমাত্র ঐ চাবিটিই নিজের কাছে রেখেছো কেন?

1-হো করে হেসে উঠে ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দিতে চেষ্টা করে বড় দিলীপ। যাচাই করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা অনু, ঐ ড্রয়ারের মধ্যে কী থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?

—বারে, আমি কি করে জানবো ?

—আচ্ছা, তোমার কী সন্দেহ হয় ?

—আমার কিছুই সন্দেহ হয় না।

—সত্যি কথা বলছো না তুমি। নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ হয়েছে তোমার। তাই এসব কথা জিজ্ঞেস করছো।

—আমার সন্দেহতে কী যায় আসে তোমার ? আমাকে যখন বিশ্বাসই করছো না তখন—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় অনু। অভিমানে মুখখানা ভারি হয়ে ওঠে তার।

অনুকে কাছে টেনে এনে নিজের কোমরে গোঁজা ড্রয়ারের সেই চাবিটা বের করে অনুর হাতে দিয়ে বড় দিলীপ বললে, বেশ তো, এই দিলাম চাবিটা তোমার হাতে। নিজের হাতে ড্রয়ার খুলে দেখ !

কৌশলে কাজ হলো। বড় দিলীপ জানে চাবি হাতে পেয়ে অনু কিছুতেই ড্রয়ার খুলবে না। হলোও ঠিক তাই। চাবিটা বড় দিলীপকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, আমি জানি ওর মধ্যে কাগজপত্র ছাড়া আর কিছু নেই।

—তা'হলে আমাকে অবিশ্বাস করছো কেন ?

—অবিশ্বাস ? তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি ? স্বামীর চোখে চোখ রেখে অনু বললে।

—তা'হলে এতক্ষণ এসব কথা বললে কেন ?

একটু সময় চুপ করে থেকে মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় অনু, ভয়ে।

—ভয়ে ? কিসের ভয় ? কৌতূহলী কণ্ঠস্বর বড় দিলীপের।

—পুলিশের ভয়। জবাব দেয় অনু।

পুলিশের প্রসঙ্গ উঠতেই দারুণ চমকে ওঠে বড় দিলীপ। সর্বনাশ, তাহলে অনু সব কিছু টের পেয়েছে নাকি ?

পুলিশের নামে বড় দিলীপের এই চমকে ওঠা চোখ এড়ায় না অনুর। স্বামীর ভাবান্তরে মনের সন্দেহ দৃঢ় হয় তার। বড় দিলীপের একটা হাত চেপে ধরে মৃদু কণ্ঠে সে বলতে থাকে, বড়লোক হতে চাই না আমি। গরীব ঘরের মেয়ে গরীবই

থাকতে চাই। বড়লোক হবার আশায় চোরাচালান করতে গিয়ে শেষে পুলিশের হাতে পড়ে বিপদ ঘটালে যে দুঃখকষ্টের আর শেষ থাকবে না।

বিস্ফারিত চোখে অনুর কথা শুনছিল বড় দিলীপ। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা এই বুঝি অনু সত্যি কথাটা বলে ফেলে। কিন্তু তার বদলে তার মুখে চোরা চালানের কথা উচ্চারিত হতেই যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে বড় দিলীপের। অনুর কাঁধের ওপর হাত রেখে সে বললে, চিন্তা করো না। তেমন কিছু ঘটবে বলে মনে করি না।

"অশ্বত্থমা হত ইতি গজ"—স্বীকার-অস্বীকার কিছুই করলে না বড়দিলীপ। নিজের মুখে সে উচ্চারণ করলে না চোরা-চালানদারদের সঙ্গে সত্যিই তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা। তার এই পাশ কাটানোর চেষ্টাকে অনু কিন্তু ধরে নেয় অন্যভাবে। মনে মনে ভাবে, তার সন্দেহই ঠিক। চোরাচালানদারদের সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক রয়েছে। সেই কথা নিজের মুখে স্বীকার করতে লজ্জা পায় বলেই বড় দিলীপ এমনিভাবে পাশ কাটিয়ে গেল।

এরপর থেকে একটু বেশি সাবধান হল বড় দিলীপ। প্রসন্ন ও কে, পি, সিংয়ের মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে গোপন কাগজপত্র জোগাড় করে বেশিদিন নিজের আলমারীতে রেখে দিতো না। সোজা পাঠিয়ে দিতো দিনাজপুরের সার্ভে সেকশনের মেজর সাহেবের কাছে।

ইদানীং প্রসন্নই হয়ে উঠেছে বড় দিলীপের সবচাইতে বড় এজেন্ট। প্রসন্ন প্রায়ই দামী দামী মাল এনে তুলে দেয় বড় দিলীপের হাতে। তার মধ্যে থাকে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর বিভিন্ন সেক্টরে অবস্থান সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য, নক্সা, গোপনীয় ম্যাপের ব্লু-প্রিন্ট, অস্ত্রশস্ত্রের বিশদ বিবরণ, গোপন মিলিটারী সার্কুলার ইত্যাদি। কৃতজ্ঞ বড়দিলীপ দু'হাত উজাড় করে পুরস্কৃত করে প্রসন্নকে। দিনাজপুরের মেজর লতিফও খুব খুশি। বর্ডারের ওপার থেকে আসে উৎসাহব্যঞ্জক বাণী—সাবাস ফজলুর রহমান, সাবাস! এমন এজেন্টের জন্যে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট পয়সা খরচ করতে মোটেই কার্পণ্য করবে না। খুব হুঁশিয়ার, এমন একটি দামী রত্ন যেন হাতছাড়া না হয়।

বড় দিলীপও বুঝতে পারে প্রসন্নকে কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেওয়া হবে না। তাকে তুষ্ট রাখতে বড় দিলীপ সর্বদাই উন্মুখ। ইদানীং প্রসন্ন তার কাছে এলে প্রচুর খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করে বড় দিলীপ। এতে অনু খুশি ছাড়া অখুশি হয় না। তবে মাঝে মাঝে তার মনে হয়, স্মাগলিংয়ের ব্যবসা রমরমা। তাই তার স্বামীর এমন উৎসাহ।

কথাটা একদিন ঘুরিয়ে বড় দিলীপকে জিজ্ঞেস করতেই বড় দিলীপ অনুর মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করে বলে ওঠে, ওকে একটু আদর-যত্ন করি, এটা তোমার ভালো লাগে না নাকি?

—না না, তাড়াতাড়ি স্বামীকে বাধা দিয়ে অনু বলতে থাকে, প্রসন্ন ঠাকুরপোকে বেশ ভাল লাগে আমার। তা'ছাড়া আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে ছেলেটি একা পড়ে থাকে ব্যাংডুবির মিলিটারী কোয়ার্টারে। মেসে খাওয়ার একঘেয়েমি থেকে রেহাই দিতে আমরা যদি তাকে এখানে একটু ভালো-মন্দ খাওয়াতে পারি তাতে ক্ষতি কি?

স্ত্রীর কথায় আশ্বস্ত বোধ করে বড় দিলীপ। একটু সময় চুপ করে থেকে সে আবার বললে, আমি কিন্তু ভাবছি অন্য কথা।।

—কি কথা? অনুর দৃষ্টি বড় দিলীপের মুখের ওপর।

জবাব দেয় বড় দিলীপ, তোমার কি ধারণা জানি না, আমি কিন্তু তোমার বাপের বাড়ির প্রত্যেককেই একান্ত আপনার বলেই মনে করি। তোমার মা বাবা থাকেন বিদেশে। তোমার ভাই-বোনেরা বড় হয়েছে। তারাই এখন নিজেদের দেখাশোনা করে। তোমাদের পিসিমা তো থেকেও নেই। কাজেই বাড়ির বড় জামাই হিসেবে আমি মনে করি তাদের সম্পর্কে আমার একটা কর্তব্য আছে।

বড়দিলীপের কথায় অনুর মনটা স্বামীর উপর কৃতজ্ঞতায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। কৃতজ্ঞ চোখে সে কেবল তাকিয়ে থাকে বড় দিলীপের দিকে।

বলতে থাকে বড় দিলীপ, তোমার বোন শেফালীকে স্নেহ করি আমি। খুবই বুদ্ধিমতী ও চটপটে। বয়সও হয়েছে। দেখেশুনে যদি ওকে একটি ভালো ছেলের হাতে তুলে দিতে পারি তা'হলে মনে করবো তোমাদের জন্যে কিছু করতে পার-

লাম। প্রসন্নকে আমার খুব ভালো লাগে। ছেলেটি সত্যিই ভালো। তাই ভাবছি—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় বড়দিলীপ।

চোখে প্রায় জল এসে পড়েছিল অনুর। স্বামীর আরও একটু কাছে সরে এসে আবেগ জড়ানো সুরে সে কেবল উচ্চারণ করে, তুমি বাস্তবিকই মহৎ।

শেফালীকে অন্য একটি পাত্রের হাতে তুলে দেওয়ার চাইতে সম্বন্ধ পাতিয়ে প্রসন্নকে পাকপাকি নিজের এজেন্ট হিসেবে বহাল রাখাই বড় দিলীপের প্রধান উদ্দেশ্য।

কথাটা বড় দিলীপ একদিন কানে তুললো প্রসন্নর। প্রসন্ন খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। অনুবৌদির বোন! দেখতে শুনতে ও স্বাভাবচরিত্রে সে যদি অনুবৌদির মতই হয় তা'হলে তো মেয়েটিকে ভালই বলতে হবে। প্রসন্ন সেদিন কেবল 'ভেবে দেখি' বলে পাশ কাটিয়েছিল।

ছোট্ট সংসার হলেও সন্তান-সম্ভবা অনুর পক্ষে একা সবদিক সামলে চলা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিদিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো শেফালী। দিদির হাত থেকে সংসারের দায়িত্ব চলে এলো শেফালীর হাতে।

১৯৬৮ সালের জুন মাস। হিন্দু মা ও মুসলমান বাপের রক্ত গায়ে নিয়ে সংসারে এলো একটি ছেলে। দেখতে অবিকল বাপের মত। তেমনি কোঁকড়ানো চুল, টানা চোখ। কেবল গায়ের রংটা মায়ের মত। ছেলে কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অনু। দেখে দেখেও যেন দেখার সাধ আর মেটে না। মাঝে মাঝে অনুযোগের সুরে বড় দিলীপকে বলে, আচ্ছা, তুমি কেমন বাপ বলো তো? ছেলের দিকে একবার ফিরেও তাকাও না।

জবাবে মৃদু হেসে বড়দিলীপ বলে, সে সুযোগ আর পাচ্ছি কোথায়? তোমার তাকানো শেষ হোক, তারপর আমি তাকাবো।

—আচ্ছা, কথার কি ছিরি, আমি যেন রাতদিন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েই থাকি! আমার যেন আর কোন কাজ নেই। কৃত্রিম অভিমানে মুখ সরিয়ে নেয় অনু।

কথাটা মিথ্যে বলেনি অনু। সুন্দর ছেলেটার দিকে তাকাতে

বাস্তবিকই ভয় হয় বড় দিলীপের। পাকিস্তানে রয়েছে তার মুসলিম বিবি ও দুটো ছেলে মেয়ে। ভয় তাদের জন্যেই। এই সুন্দর ছেলেটার আকর্ষণে সে যদি তাদের ভুলে যায়? একে তো অনুভার আকর্ষণ, তার ওপর আবার এই ছেলে। পাকিস্তানে তার ছেলেমেয়েরা তো জানে তাদের আব্বাজান বিদেশে চাকরি করে। তারা যদি জানতে পারে হিন্দুস্তানের মাটিতে তাদের আব্বাজান হিন্দু বৌ-ছেলে নিয়ে দিব্বি ঘর সংসার করছে তা'হলে ভবিষ্যতে সে তাদের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে?

চটুলা শেফালী বাস্তবিকই বুদ্ধিমতী। দিদির কাছে যতদিন সে ছিল তার মধ্যে প্রসন্ন বারবার তার জামাইবাবুর কাছে এসেছে। চার চক্ষের মিলনও হয়েছে অনেক বার।

অবশেষে দিদি একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই শেফালী চলে যায় নিজেদের বাড়িতে। আর তার পরেই প্রসন্ন একদিন বড় দিলীপকে সলজ্জ কণ্ঠে বললে, ভেবে দেখলাম আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করাই উচিত। আপনার শালীকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই।

বেজে উঠলো বিয়ের শাঁখ। বিয়ে হয়ে গেল প্রসন্নর সঙ্গে শেফালীর। খরচ-খরচা প্রায় সবই করলো বাড়ির বড় জামাই বড় দিলীপ। আত্মীয়-পরিজনেরা বড় দিলীপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন জামাই পাওয়া বাস্তবিকই ভাগ্যের কথা। গর্বে ভরে উঠলো অনুর বুক। পতিগর্বে সত্যিই সে গর্বিত। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার আনন্দে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বড় দিলীপ ওরফে দিলীপ দে ওরফে পাকিস্তানী গুপ্তচর ফজলুর রহমানের।

॥ ভের ॥

গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে একটা পাখীকে আদর করতে করতে হঠাৎ তার গলা চেপে ধরে কণ্ঠরোধ করার মুহূর্তে পাখীটার যে অবস্থা হয় অনুভার অবস্থাও প্রায় তেমনি। বিয়ের আগে

অনুভা জানতো বড় দিলীপ কলকাতার একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। বিয়ের পরে তার সন্দেহ হলো সহর শিলিগুড়ির স্মাগ্‌লিং চক্রের সঙ্গে তার স্বামী জড়িত। প্রসন্নও জড়িত রয়েছে এই চক্রের সঙ্গে। সেই সুবাদেই পয়সা-কড়ির লেন-দেন হয় বড় দিলীপ ও প্রসন্নর মধ্যে।

স্মাগ্‌লিং নিঃসন্দেহে একটা অপরাধ। বড় দিলীপ ও প্রসন্নকে সেই অপরাধে অপরাধী ধরে নিয়ে তাদের সম্পর্কে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকতো অনুভা। ভয় ছিল পুলিশ টের পেলে আর রক্ষে নেই, তাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। স্মগলারদের সম্পর্কে এর চাইতে বেশী কোন মানসিকতার অধিকারী ছিল না অনু। এবং ছিল না বলেই প্রসন্ন এই দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে জেনেও তার হাতে নিজের ছোট বোনকে তুলে দিতে তার বাধেনি। মনে মনে সে বলেছে, তার স্বামী ও প্রসন্ন যখন একই দোষে দোষী তখন এই দোষটুকু গ্রাহ্যের মধ্যে না আনাই উচিত। কিন্তু সেদিন কথায় কথায় শেফালীর মুখে আসল ব্যাপারটা জানতে পেরে অনুর অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো কণ্ঠরোধ হওয়া পাখীটির মত। এক অপরিসীম ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠলো।

অনুভা একজন বিরাট দেশপ্রেমিকা নয়। দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মত মানসিকতাও তার নেই। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ একটি যুবতী সে। লেখা-পড়াও বেশী করেনি। কিন্তু পয়সার বিনিময়ে দেশের স্বার্থ বিদেশীর কাছে বিলিয়ে দেওয়া যে ঘৃণ্য অপরাধ, এ বোধ তারও আছে।

ভাইফোঁটা উপলক্ষে বাপের বাড়ি এসেছে অনু। এসেছে সদ্য বিবাহিতা শেফালীও। প্রসন্ন বিয়ের পর ব্যাংডুবির কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে শিলিগুড়িতেই বাসা ভাড়া করে আছে।

সাংসারিক কথার মধ্যে শেফালী হঠাৎ এক সময় প্রসন্ন সম্পর্কে বলে ওঠে, ভারি তো মিলিটারী অফিসের চাকরি। সরকার যা মাইনে দেয় তাতে তো জল গরমও হয় না। জামাইবাবু না থাকলে সংসার চালানোই দায় হতো।

শেফালীর কথায় অনুর মনে পড়ে যায় বড় দিলীপ ও প্রসন্নর স্মাগলিংয়ের কথা। সারা মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে তুলে সে বললে, তা তো বুঝলাম। কিন্তু এসব কাজ কি ভালো? গোপনে বিদেশী জিনিস-

পত্রের ব্যবসা অবশ্য আজকাল এখানে অনেকেই করে। কিন্তু যেদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সেদিন তো ঘটি-বাটি বিক্রি করে মামলার খরচ জোগাতে হয়।

অনুর কথার জবাব না দিয়ে শেফালী কেবল তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। অনু আবার বলতে থাকে, তোর জামাইবাবু আর প্রসন্ন দুজনই যে এই ব্যবসা চালাচ্ছে তা' আমি টের পেয়েছি। তোর জামাইবাবুকে তো বললেও কথা কানে তোলে না। এসব খারাপ কাজ না করাই ভালো। তুই বরঞ্চ চেষ্টা কর যাতে প্রসন্নকে এই পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারিস।

দিদির কথা শুনতে শুনতে শেফালীর ভ্রূ-যুগল ক্রমেই কুঞ্চিত হয়ে উঠছিল। অবশেষে অনু থামতেই শেফালী খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, তোকে বুঝি জামাইবাবু এই কথাই বলেছে?

—কোন্ কথা?

—বিদেশী জিনিসপত্রের স্মাগ্‌লিংয়ের কথা।

—তোর জামাইবাবু বলবে কেন? আমিই টের পেয়েছি।

—কি করে টের পেলি?

—ঐ সংক্রান্ত কাগজপত্র সে খুব সাবধানে আলমারিতে রাখে।

—কাগজপত্র ছাড়া আর কোন জিনিসপত্র দেখেছিস?

মাথা নাড়ে অনু। শেফালী আবার জিজ্ঞেস করে, তাহলে কি করে বুঝলি ঐ কাগজপত্র স্মাগ্‌লিং সংক্রান্ত?

আর কোন জবাব জোগায় না অনুর মুখে। শেফালী তার এই সরল দিদিটির সারল্যে মনে মনে একটু হাসে। নিজের মনে বলে, জামাইবাবু লোকটি তো দেখছি বেশ শেয়ানা। দিদিকে ধোঁকা দিয়ে বেশ কাজকারবার চালাচ্ছে।

এবার কৌতূহলী হয়ে ওঠে অনু। শেফালীকে জিজ্ঞেস করে, বিদেশী জিনিসের চোরাচালানের ব্যবসা করে না ওরা?

মুখে কোন জবাব না দিয়ে কেবল মাথা নাড়ে শেফালী। অনু আবার জিজ্ঞেস করে, তা'হলে ঐ সব গোপন কাগজপত্র কিসের?

একটু সময় চুপ্ করে থেকে শেফালী মনে মনে বিবেচনা করে সত্যি কথাটা দিদিকে বলে দেওয়া ঠিক হবে কিনা। তার এই দিদিটি এতদিনে যা টের পায়নি, সে নিজে কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যেই তা ধরে ফেলেছে। প্রসন্ন অবশ্য তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে,

একথা যেন আর কেউ জানতে না পারে। তা'হলে কিন্তু আমাকে নির্ঘাৎ জেলে যেতে হবে।

স্বামীকে কথা দিয়েছিল শেফালী। কথা রেখেওছিল। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার মনে হলো দিদির কাছে আসল কথাটা ফাঁস করে দিয়ে নিজের চতুরতা প্রকাশ করলে ক্ষতি কি? তা'ছাড়া, তার জামাইবাবুই তো এই কাজের প্রধান নায়ক।

সন্তর্পণে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অনুর আরও একটু কাছে সরে এসে শেফালী ফিস্ ফিস্ করে বললে, খুব সাবধান দিদি, একথা প্রকাশ হয়ে পড়লে কিন্তু জামাইবাবুর বিপদ হবে।

অনুর কৌতূহল তখন তুঙ্গে। অধৈর্য কণ্ঠে সে বললে, বলে ফেল না কথাটা। আমি কচি খুকি নাকি যে একথা সবাইকে ডেকে বলতে যাবো?

শেফালী তেমনি ফিস্ ফিস্ করে বললে, ওসব চোরা চালান টালান কিছু নয়। ওরা দু'জনে মিলে মিলিটারীর গোপন কাগজপত্র ও খবরা-খবর পাকিস্তানে চালান করে। ও ওর অফিস থেকে ঐসব কাগজপত্র লুকিয়ে নিয়ে এসে জামাইবাবুকে দেয়। আর জামাইবাবু তা পাচার করে পাকিস্তানে! এই বাবদ বর্ডারের ওপার থেকে প্রচুর পয়সা-কড়ি আসে।

শেফালী কেমন অম্লান বদনে বলে গেল কথাগুলো। যেন এটা সাধারণ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি এমনই তার বলার ভঙ্গি। কিন্তু শেফালী যত সহজে কথাটা বলতে পারলে, অনু তো তত সহজে একে গ্রহণ করতে পারছে না। তার কেবলই মনে হতে থাকে, তার স্বামী একজন হীন চরিত্রের দেশদ্রোহী।

দিদিকে চুপ করে থাকতে দেখে শেফালী বললে, ওকি, তুই যে একেবারে বোবা হয়ে গেলি, দিদি! আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?

ম্লান কণ্ঠে অনু বললে, তুই এতসব জানলি কেমন করে?

শেফালী বললে, বুদ্ধি থাকলেই জানা যায়। চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। তুই তো চিরকাল সাদা-সিধেই রয়ে গেলি। তাই এতদিনেও আসল ব্যাপার জানতে পারিস নি।

সত্যিই তাই। অনু বরাবর সাদা-সিধেই বটে। একজন প্রেমময় স্বামীকে নিয়ে নিজের একটি ছোট্ট সংসারে নিমগ্ন থাকাই ছিল

তার একমাত্র কামনা। তেমন একটি সংসার সে বাস্তবিকই পেয়েছে। স্বামীও জুটেছে তার মনের মত। কোলে এসেছে একটি সোনার চাঁদ ছেলে। কিন্তু একি কথা সে শুনছে শেফালীর মুখে? তার স্বামী নাকি দেশদ্রোহী। পয়সার লোভে সে নাকি দেশের স্বার্থ বিলিয়ে দিচ্ছে বিদেশের কাছে! কেবল তার স্বামীই নয়, আগ্রহের সঙ্গে যার হাতে নিজের ছোট বোনকে সে তুলে দিয়েছে সেই প্রসন্নও নাকি এই জঘন্য কাজে লিপ্ত। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে শেফালী। এ নিয়ে যেন ওর তেমন কোন ভাবনা চিন্তা নেই।

সময় সময় বিশ্বাস বস্তুটি যেমন অন্ধ তেমনি কেউ অন্যায়-ভাবে সেই অন্ধত্বের সুযোগ গ্রহণ করলে সেই বিশ্বাসই আবার অতিরিক্ত চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। ইদানীং বড় দিলীপের প্রতিটি কাজের মধ্যেই অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করে অনু। তীক্ষ্ণ নজর রাখে তার ওপর। অনুর চোখে জেগে ওঠে অতিরিক্ত সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করে না বড় দিলীপকে।

একদিন দুপুরে স্বপন একখানা বন্ধ-খাম এনে অনুর হাতে দিয়ে বললে, বৌদি, দিলীপ এলে এটা ওকে দেবেন। খুব জরুরী।

নতুন কিছু নয় এটা। এর আগেও স্বপন এমনি অনেক খাম অনুর হাত দিয়ে গেছে। কোন প্রশ্ন না করে অনু তা রেখেছে এবং বড় দিলীপ বাড়ি এলে তার হাতে তা তুলে দিয়েছে।

কিন্তু সেদিন আর নিজের কৌতূহল চেপে রাখতে পারলো না অনু। জল দিয়ে সাবধানে খামের মুখ খুলে ভেতরের চিঠিখানার ওপর চোখ রাখতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে। এ কার চিঠি? খামের উপর ইংরেজিতে নাম লেখা—দিলীপ দে, শিলিগুড়ি। কিন্তু চিঠির ভেতরে সম্বোধন করা হয়েছে "মাই ডিয়ার ফজলুর" বলে।

বাইরে দিলীপ দে, ভেতরে ফজলুর। কিন্তু কে এই ফজলুর? কী তার পরিচয়? ডাকে আসেনি চিঠিটা, এসেছে লোকমারফৎ। অনু তেমন একটা লেখাপড়া জানে না, কাজেই ইংরেজিতে লেখা চিঠির বিষয়বস্তু সে বুঝতে পারে না। কিন্তু এই দিলীপ ফজলুর ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে তার মনোজগতে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে। মাথাটা ঘুরে ওঠে তার। কোনরকমে শোবার ঘরের তক্তপোষের কাছে সরে গিয়ে ঘুমন্ত ছেলেকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

শরীর খারাপের অজুহাতে সারাদিন বিছানায় শুয়েই কাটালে অনু। অবশেষে বিকেলে ছেলে ঘুম থেকে জেগে উঠতেই তাকে খাইয়ে, জামাকাপড় পরিয়ে পাশের ঘরের ভাড়াটে মেয়েটির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়ালে বড় দিলীপের সামনে।

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কি যেন লিখছিল বড় দিলীপ। অনুকে দেখে লেখা বন্ধ করে উঠে বসে সে তাকায় তার দিকে। অনুর মুখখানা শুকনো। জিজ্ঞেস করে বড় দিলীপ, কি হয়েছে? জ্বর টর নাকি?

স্বামীর কথার জবাব না দিয়ে অনু জিজ্ঞেস করে, কি লিখছিলে?

হাসতে চেষ্টা করে জবাব দেয় বড় দিলীপ, এই—অফিসের কাজকর্ম আর কি—।

—কোন অফিসের? স্বামীর চোখে চোখে রাখে অনু।

—তার মানে? ভ্রু কুঁচকে ওঠে বড় দিলীপের।

—তোমার কলকাতার সেই কোম্পানীর, নাকি—। কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ থেমে যায় অনু।

হঠাৎ মুখে একটা হালকা হাসি ফুটিয়ে তুলে বলে ওঠে বড় দিলীপ, ও—তুমি সেই দু'নম্বরী ব্যবসার কথা বলছো? তা যাই বলো বাপু, স্বীকার করছি স্মাগ্‌লিং করা খারাপ কিন্তু—।

বড় দিলীপের কথা শেষ হবার আগেই অনু তাকে থামিয়ে দিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বললে, না আমি চোরাকারবারের কথা বলছি না, কারণ আমি জানি তুমি ঐ কাজ করো না।

দারুণ চমক ওঠে বড় দিলীপ। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে কোথাও একটা কিছু অঘটন ঘটেছে এবং তাতেই বোধহয় অনুর মনে কোন সন্দেহের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। কিন্তু কি ধরনের অঘটন ঘটেছে এবং অনু তার সম্পর্কে কতটা কি জানতে পেরেছে বুঝতে না পেরে মনে মনে সে ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

বড় দিলীপকে চুপ্‌ করে থাকতে দেখে অনু আবার বললে, চোরাচালানের ব্যবসা খারাপ, কিন্তু এক দেশের গোপন খবর অন্য দেশে পাচার করে দেশকে বিপদে ফেলা ভয়ঙ্কর অপরাধ।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সামান্য আলোর রেখা। অনুর কথার ধরনে বড় দিলীপের মনে খানিকটা আশার সঞ্চার হয়। অনু জানতে পেরেছে তার আসল কাজ কারবারের কথা। কিন্তু জানতে পারেনি

তার আসল পরিচয়। সেকথা জানতে পারলে সে তাকে হয়তো সরাসরি বিদেশী গুপ্তচর বলেই উল্লেখ করতো। কিন্তু তা সে করেনি। হয়তো তাকে দেশদ্রোহী বলেই ভাবছে।

অনুকে একটু পরীক্ষা করতে গিয়ে বড় দিলীপ এবার মুখ তোলে। পূর্ণ দৃষ্টিতে অনুর দিকে তাকিয়ে অনুরোধের সুরে চাপা কণ্ঠে বললে, দোহাই তোমার, একটু আস্তে কথা বলো। কেউ শুনতে পেলে বিপদে পড়তে হবে। স্বীকার করছি আমি অপরাধ করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, এছাড়া বেঁচে থাকার আর কোন পথ পাই নি আমি।

হঠাৎ বলে ওঠে অনু, ফজলুর কে ?

ভয়ঙ্কর চমকে ওঠে বড় দিলীপ। সর্বনাশ, অনু বোধহয় সব কিছুই জানতে পেরেছে। বড় দিলীপ যে এক ঘৃণ্য বিদেশী গুপ্তচর এটা বোধহয় আর জানতে বাকী নেই তার। তবুও শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে সে বলতে থাকে, ফজলুর কে আমি ঠিক জানি না।

—তাকে চেনো না তুমি ? অনুর চোখে স্থির দৃষ্টি।

—তুমি এই নামটা কোথায় পেলে ?

—যেখানেই পেয়ে থাকি না কেন, তোমার নিজের মুখ থেকেই শুনতে চাই ফজলুর ও দিলীপ দে একই লোক কিনা।

এরপরে প্রতিরোধের চেষ্টা একেবারেই নিরর্থক। তার চাইতে এবার সন্দেহকারীকে স্বমতে আনার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে গিয়ে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দেয় বড় দিলীপ। তারপর অনুর কাছে ফিরে এসে অপরাধীর ভঙ্গিতে বলতে থাকে, তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। এতদিন তোমাকে ভাঁওতা দিয়ে তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি। কিন্তু আর নয়। তোমার কাছে ক্ষমা চাইবারও আর মুখ নেই আমার। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি বাস্তবিকই ভালোবাসি। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আমি, নাম ফজলুর রহমান। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে এখানে বসে গুপ্তচরের কাজ করছি। একাজে আমাকে সাহায্য করছে তোমাদের দেশেরই একদল মানুষ। আমার সব কিছুই মিথ্যে কিন্তু তোমার আমার সম্পর্ক মোটেই মিথ্যে নয়।

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এ ছাড়া ফজলুরের আর কোন পথই খোলা ছিল না। কথাটা শেষ করে ফজলুর অনুর হাত দু'টি ধরতেই

অনু অস্বাভাবিক চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে ফজলুরের মুখের দিকে। প্রচণ্ড এক বেদনায় তার সুন্দর মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই ফজলুর কিছু বোঝার আগেই জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়ে ফজলুরেরই বুকের ওপর।

॥ চৌদ্দ ॥

ইদানীং অনুভা যেন হয়ে উঠেছে একটি যন্ত্রচালিত পুতুল।

প্রথম প্রথম বড় দিলীপ ওরফে ফজলুর রহমান স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করতো। বলতো, তুমি-আমি ধর্মে হিন্দু-মুসলমান হলেও আমরা দু'জনেই মানুষ। কাজেই—।

বড় দিলীপ কথটা শেষ করার আগেই স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলে উঠেছিল অনুভা, না, তুমি মানুষ নও।

গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করেছিল বড় দিলীপ, মুসলমান বলে কি আমি মানুষ নই?

—না, তা নয়, জবাব দিয়েছিল অনুভা, মুসলমান বলে নয়, প্রতারক বলেই তুমি মানুষ নও।

—প্রতারণা না করলে তো তোমাকে পেতাম না। স্ত্রীর আরও কাছে সরে এসে বলেছিল বড় দিলীপ, হিন্দুর ছদ্মবেশ না ধরলে তুমি কি সেদিন আমাকে ঘেঁসতে দিতে তোমার কাছে?

—মিথ্যে বলো না, ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল অনুভা, আমার জন্যে তুমি হিন্দুর ছদ্মবেশ ধরো নি। ধরেছিলে নিজের পাপ কাজ ঢাকবার জন্যে।

—পাপ কাজ? কাকে পাপ কাজ বলছো?

বিদ্রুপের সুরে বলে উঠেছিল অনুভা, এদেশের বুকের উপর বসে এদেশেরই সর্বনাশ করাকে বুঝি পুণ্যের কাজ বলে?

সহসা কোন জবাব দিতে পারে নি বড় দিলীপ। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে অবশেষে সে বলেছিল, আমি পাকিস্তানী মুসলমান। তাই

পাকিস্তানের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তিকে আমি পুণ্যের কাজ বলেই মনে করি।

সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল অনুভা, আমি এদেশের মেয়ে। এদেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিকে আমি পাপ কাজ বলেই মনে করি। আমার উচিত তোমাকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয়া।

—তাই যদি মনে করো তা'হলে দিচ্ছ না কেন?

—দিচ্ছি না ঐ ছেলেটার কথা চিন্তা করে। তোমার সন্তান হলেও ওকে তো পেটে ধরেছি আমিই।

এরপর থেকে বড় দিলীপ আর ঘাঁটাতো না অনুভাকে। সে বুঝেছিল, অনুভা যেমন কোনদিন তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে না, তেমনি কোনদিন তাকে স্বাভাবিক ভাবে মেনেও নেবে না। কিন্তু তাই বলে অনুভাকে ছেড়ে চলে যাবার কথাও ভাবতে পারে না বড় দিলীপ। প্রয়োজনে পূর্ব পাকিস্তানের সেই মুসলিম স্ত্রীকে সে তালাক দিতে পারে, কিন্তু অনুভাকে কিছুতেই নয়।

প্রসন্নকে স্বামী হিসেবে পেয়ে অনুভার বোন শেফালী কিন্তু খুব খুশি। তার খবরদারী করা চরিত্রর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছিল প্রসন্নর নির্বিরোধী শান্ত চরিত্র। প্রসন্নর গোপন কাজের সঙ্গেও সে মিশিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। অফিস থেকে গোপন দলিল পত্র চুরি করে বড় দিলীপের হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপার নিয়ে স্বামী-স্ত্রী শুয়ে শুয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ফন্দি আঁটতো। এরকম একটি স্ত্রীরত্ন হাতের কাছে পেয়ে প্রসন্নও খুশি। এতদিনে মন্ত্রণা করার মত একজন লোক তার জুটলো।

শিলিগুড়ি সহরের রবীন্দ্রনগরের সুন্দরী বাড়িওয়ালীর বাড়িটিই এতদিন ছিল পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্রের আসল ঘাঁটি। পাকিস্তানী গুপ্তচর ফজলুর রহমান এখানেই থাকতো তার হিন্দু স্ত্রী অনুভা ও তাদের শিশুপুত্রকে নিয়ে। এখানেই আর একটা ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসেছিল আরও একজন গুপ্তচর স্বপন চৌধুরী ওরফে আব্দুল করিম। স্বপনের একান্ত অনুগত এজেন্ট মনোরঞ্জন সরকারও সস্ত্রীক বাস করত এই বাড়িতে।

কিন্তু একদিন হঠাৎ ভেঙ্গে গেল সেই ঘাঁটি। মনোরঞ্জন বদলি হয়ে গেল সিকিম রাজ্যের রাজধানী গ্যাংটক। সরকারী আদেশ, অন্যথা করা চলে না। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে

শিলিগুড়ির বাস তুলে দিয়ে সপরিবারে চলে যেতে হলো সেখানে। তবে যাবার আগে সে স্বপনকে যথারীতি আশ্বাস দিয়ে গেল যে ওখানে বসেই সে যথাসাধ্য সাহায্য করবে তাকে। বাঘ জঙ্গল পাল্টালেও মানুষের রক্তের স্বাদ কখনও ভোলে না। মনোরঞ্জনের অবস্থাও অনেকটা তাই। এদিকে পারিবারিক অশান্তি এড়াতে বড় দিলীপ ওরফে ফজলুর রহমানকেও ওখানকার বাস তুলে দিয়ে অনুর সঙ্গে চলে যেতে হলো অনুর বাপের বাড়িতে। মনে আশা, ওখানে নিজের ভাইবোনদের মধ্যে থাকলে অনুর মানসিক অশান্তি হয়তো খানিকটা দূর হবে। অসুবিধা হলেও সে নিজেও না হয় স্ত্রীর কথা চিন্তা করে সেখানেই থাকবে। কাজেই সুন্দরী বাড়িওয়ালীর রবীন্দ্রনগরের বাড়িতে কেবল একাই পড়ে রইলো স্বপন ওরফে আব্দুল করিম।

সুগঠিত গুপ্তচর চক্র। এতদিন পাশাপাশি বাস করেও ঐ বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা যেমন বড় দিলীপ কিংবা স্বপনের আসল পরিচয় জানতে পারেনি তেমনি মনোরঞ্জনের ঘৃণ্য কাজকর্ম সম্পর্কেও কোন রকম সন্দেহ করতে পারেনি তারা। এমনকি কুঞ্জবিহারীও কোন দিন সন্দেহ করে নি যে তার প্রিয় বন্ধু মনোরঞ্জন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর গোপন খবর নিয়মিত তুলে দিয়ে চলেছে স্বপনের হাতে।

কুঞ্জবিহারীও ঐ বাড়ির বাসিন্দা। একার সংসার। নিজের হাতেই রান্না করে খায়। দুপুরে বেরিয়ে যায়, বেশি রাতে ফেরে। কাছাকাছি আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে বলেও মনে হয় না। মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মত এসে উদয় হয় একটি তরুণ, নাম তার রাজা রায়। রাজা নাকি কুঞ্জবিহারীর কোন্ এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। দু'চার দিন থাকে কুঞ্জর কাছে, তারপর একদিন আবার উধাও হয়ে যায়।

বয়সের কিছু তফাৎ থাকলেও কুঞ্জর সঙ্গে খুবই বন্ধুত্ব ছিল মনোরঞ্জনের। তার ছেলে-মেয়েদের কাছে কুঞ্জ ছিল খুবই প্রিয়। সেই সুবাদে মনোরঞ্জনের স্ত্রীও স্নেহ করতো কুঞ্জকে। সময় সময় রান্না খাবারও সে পাঠিয়ে দিত তাকে।

মনোরঞ্জনের সঙ্গে স্বপনের ঘনিষ্টতা কিন্তু ভালো চোখে দেখতো না কুঞ্জ। তাই মনোরঞ্জন—স্বপন—বড় দিলীপ, এই ত্রিভুজের কাছে তেমন একটা ঘেঁসতো না সে।

এমনি দিনে মনোরঞ্জন সপরিবারে চলে গেল গ্যাংটক। সেদিন মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল কুঞ্জর। ওদের সবাইকে গ্যাংটকের স্টেশন-ওয়াগনে তুলে দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে অনেকক্ষণ এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে বাড়ি ফিরেছিল সে।

স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বন্ধুত্বের প্রখরতা স্বাভাবিক কারণেই কিছু চোখ ধাঁধানো। তাই, দিন পনেরো যেতে না যেতেই বন্ধুর অদর্শনে বিরহ-কাতর মন নিয়ে স্বপন একদিন এসে হাজির হলো গ্যাংটকে মনোরঞ্জনের কাছে। গুপ্তচরবৃত্তির ট্রেনিংপ্রাপ্ত অফিসার স্বপন। সে জানতো দামী এজেন্টদের বেশিদিনে চোখের আড়ালে রাখতে নেই। সাহচর্য ও পয়সা-কড়ি দিয়ে সর্বদাই তাদের তাতিয়ে রাখতে হয়। নইলে হয় তারা অন্য কারুর ফাঁদে গিয়ে পড়ে, নয়তো একেবারে ঠাণ্ডা এবং অকেজো হয়ে যায়। এখানে অন্য কেউ বলতে কেবল ফজলুর। নিয়ম বহির্ভূত হলেও একই পথের পথিকের মধ্যে রেষারেষিও প্রচুর। যে যার নিজের পাতে ঝোল টেনে ষোল আনা ক্রেডিট নিতে চায়। ফজলুর ওরফে বড় দিলীপের অবশ্য প্রসন্ন ও কে. পি. সিং রয়েছে। প্রসন্ন তো দস্তুরমত দামী এজেন্ট। তাছাড়া, ফজলুর বুদ্ধি করে তাকে বেঁধে ফেলেছে আত্মীয়তার পাশে। কিন্তু তাই বলে ফজলুর যে গ্যাংটক পর্যন্ত ছুটে এসে মনোরঞ্জনের দিকে হাত বাড়াবে না তার স্থিরতা কোথায়?

উদ্দেশ্য কিন্তু সেদিন সিদ্ধ হলো না স্বপনের। মনোরঞ্জন তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করলো। মিলিটারী অফিসারের কাছ থেকে অর্ধদিবসের ছুটি নিয়ে গ্যাংটক প্যালেসের সামনের সুন্দর সাজানো-গোছানো বাগানের মধ্যে অবস্থিত ভ্রমণবিলাসীদের বিশ্রামঘরে বসে গল্পগুজব করলো, কিন্তু কাগজপত্র কিছুই দিতে পারলে না। বললে, বড়ই কড়াকড়ি শুরু হয়েছে আজকাল। তা'ছাড়া, এখানকার অফিসারেরা বড়ই সজাগ। তা'হলেও বলছি, চিন্তা নেই। আরও কিছু দিন যাক। সুযোগমত নিশ্চয়ই কিছু ভালো 'মাল' হাতিয়ে নিতে পারবো। আপনাকে আর কষ্ট করে এখানে আসতে হবে না। 'মাল' হাতে এলে আমি নিজেই শিলিগুড়ি গিয়ে আপনার হাতে তা' পৌঁছে দিয়ে আসব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কাজেই শেষপর্যন্ত সেদিন স্বপনকে খালিহাতেই গ্যাংটক থেকে ফিরে আসতে হলো শিলিগুড়ি।

গরজ কেবল একা স্বপনের নয়, মনোরঞ্জনেরও। যেখানে 'মাল' মানেই নোটের বাণ্ডিল সেখানে মনোরঞ্জনের মত রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ কি বেশিদিন চুপ করে বসে থাকতে পারে? অবশেষে এক ছুটির দিন কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে মনোরঞ্জন রওনা হলো শিলিগুড়ির পথে। ব্যাগের মধ্যে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারী ম্যাপ ছাড়া কতগুলো জরুরি মিলিটারী কাগজ। এগুলো দিন কয়েক আগেই সে হাতিয়েছে অফিসারদের চোখে ধুলো দিয়ে।

সঙ্গে 'মাল' নিয়ে বেশিক্ষণ বাসের মধ্যে বসে থাকতে বড়ই ভয় করছিল মনোরঞ্জনের। সে বুদ্ধিমান। সে জানে গুপ্তচরের পেছনেও গোয়েন্দা থাকে। এস্‌পিওনেজের পেছনে কাউন্টার-এস্‌পিওনেজ। 'মাল' সহ তাদের কারুর হাতে ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। যেতে হবে সোজা শ্রীঘরে। তারপরে কোর্ট-মার্শাল তো আছেই। আর, সঙ্গে 'মাল' না থাকলে অপরাধী প্রমাণ করা খুবই শক্ত।

বিকেল নাগাদ শিলিগুড়ি পৌঁছে মনোরঞ্জন সোজা চলে এলো রবীন্দ্রনগরে স্বপনের বাড়িতে। কিন্তু হা হাতোস্মি? যার জন্যে এতদূর ছুটে আসা সেই স্বপন বাইরে চলে গেছে। ফিরবে পরের দিন। তার ঘর তালাবন্ধ।

মনোরঞ্জন এখন কি করবে? তার দুশ্চিন্তা সঙ্গের 'মাল' নিয়ে। এ জিনিস সঙ্গে নিয়ে গ্যাংটক ফিরে গিয়ে নিজের কাছে রেখে দেয়া খুবই বিপজ্জনক। আবার, এখানেও বা এগুলো সে কার কাছে দিয়ে যাবে?

হঠাৎ একটা কথা মনে হতে মনোরঞ্জন বাড়িওয়ালীর মেয়ে রূপাকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে রূপা, আজকাল তোর কুঞ্জদা তোদের কাছে ঘরের চাবি রেখে যায় না?

মাথা নেড়ে সায় দেয় রূপা। মনোরঞ্জন আবার বললে, তা'হলে কুঞ্জর ঘরের চাবিটা একবার এনে দে তো। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, বড্ড ক্লান্ত লাগছে। ওর বিছানায় খানিকক্ষণ গড়িয়ে নিয়ে তারপর ফিরে যাবো।

—আপনি আজই গ্যাংটক ফিরে যাবেন? স্বপনদা কিম্বা কুঞ্জদার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

—ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু কুঞ্জর ফিরতে তো রাত হয়। আর স্বপন-বাবু তো কাল ফিরবে।

রূপা আর কিছু না বলে কুঞ্জর ঘরের চাবি এনে দেয়। মনোরঞ্জন ঘর খুলে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কুঞ্জর বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে।

সন্ধ্যা নাগাদ মনোরঞ্জন কুঞ্জর ঘরের দরজা বন্ধ করে চাবিটা রূপার হাতে দিয়ে বললে, শোন্ রূপা, তোর কুঞ্জদাকে বলবি কাল রাতে আমি এসে এখানে থাকবো। পরশু সকালে আবার চলে যাবো। বিশেষ দরকার আছে।

মাথা নেড়ে সায় দেয় রূপা। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গ্যাংটকের বাস স্ট্যাণ্ডের পথে বেরিয়ে পড়ে মনোরঞ্জন।

বিপদ যখন আসে তখন হঠাৎই আসে। মানুষের কাছে সেই বিপদের জন্যে দায়ী ঘটনাগুলোর কার্য-কারণ সম্পর্কে যতই কেন না অভিনব হোক, সেই অঘটন-ঘটন-পটিয়সীর কাছে এগুলো বোধহয় একেবারে ছকে বাঁধা। তাই যদি না হবে তা'হলে সেদিন হঠাৎ রাজা এসে হাজির হবে কেন সেখানে?

ঝোড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে হাজির হয়ে রাজা বাড়ি-ওয়ালী সুন্দরীকে বললে, দাদার ফিরতে তো রাত হবে। ঘরের চাবিটা দিন, মাসীমা।

সুন্দরী ও তার মেয়ে রাজাকে চেনে। এর আগেও সে এমনিভাবে কুঞ্জর অনুপস্থিতিতে চাবি নিয়ে গেছে।

সুন্দরী রূপাকে ডেকে বললে, ও রূপা, তোর কুঞ্জদার ভাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চাবিটা দে।

—এই হয়েছে আমার এক কাজ! দাঁতে চুলের ফিতে চেপে ধরে চুল বাঁধতে বাঁধতে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠে রূপা, এই একজন এলো, আবার চলে গেল। আবার আর একজন এলো। কথাটা বলতে বলতে দুম্‌দাম পা ফেলে রূপা বারান্দায় এসে চাবিটা তার মায়ের হাতে দিয়েই আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়।

রাজার সামনে মেয়ের বিরক্তি প্রকাশে মনে মনে একটু লজ্জা পায় সুন্দরী। চাবিটা রাজার হাতে তুলে দিতে দিতে বললে, আর বাবা, বলো কেন। এই তো কিছুক্ষণ আগে গ্যাংটক থেকে মনোরঞ্জন এসেছিল। তোমার দাদার ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে এই মাত্র চলে গেল।

—ও, তাই বুঝি ? কথাটা বলেই রাজা আর দাঁড়ায় না সেখানে। চাবি নিয়ে চলে যায় কুঞ্জর ঘরের উদ্দেশে।

ঘরের দরজা ভেজিয়ে কুঞ্জর বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে রাজা। সারাদিন খাওয়া হয়নি। পকেটেও পয়সা নেই যে দোকান থেকে কিছু কিনে এনে খাবে। তার কুঞ্জদার ফিরতে তো অনেক দেরী। তারপর রান্নার ব্যবস্থা।

বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করে একসময় উঠে পড়ে রাজা। পেটের ভেতর মোচড় দিচ্ছে। ঘরে কি সামান্য কিছু খাবারও মজুত নেই ? নিদেন পক্ষে দু'চার মুঠো মুড়ি হলেও তার আপাততঃ চলবে।

স্ত্রীলোকের স্পর্শহীন একা পুরুষের সংসার। লক্ষ্মীশ্রীর ছিটে ফোঁটাও নেই। ছেঁড়া কাগজ, দেশলাইয়ের কাঠি ও পোড়া সিগারেটে এক হাঁটু হয়ে রয়েছে ঘরের মেঝে। এক কোণে ধুলোয় জর্জরিত একটা জলের কুজো। আধ-গোটানো মশারির দু'টো কোণ ঝুলে রয়েছে ময়লা বিছানার ওপর। দেয়ালের কোণে মাকড়সার রাজত্ব। ঘরের আর এক কোণে কালি ঝুলি পড়া রং-চটা একটা কেরোসিন স্টোভ। তারই সামনে এ্যালুমিনিয়ামের এঁটো থালা বাটি। দেয়াল সংলগ্ন লম্বা তাকের ওপর ডাঁই করা রয়েছে পুরানো খবরের কাগজ। তারই একপাশে ধুলো ধূসরিত কয়েকটা ছোট-বড় টিনের কৌটো।

মুড়ির আশায় একটার পর একটা সেই কৌটাগুলো পরীক্ষা করতে থাকে রাজা। কোনটায় পড়ে আছে একমুঠো ডাল, কোনটায় বা লেগে রয়েছে চিনির দানা। অধিকাংশ কৌটোই খালি।

হঠাৎ একটা মাঝারি ধরনের কৌটোর ঢাকনা খুলতেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে রাজা। এগুলো আবার কি ?

রাজা মোটামুটি লেখাপড়া জানে। কৌটোর ভেতরের ভাঁজ করা কাগজ-পত্রগুলো নামিয়ে এনে খুলে দেখতে থাকে। আশ্চর্য ব্যাপার, তার কুঞ্জদার ঘরে এই সব মিলিটারী ম্যাপের ব্লু প্রিণ্ট, মিলিটারী সার্কুলার এলো কি করে ? তবে কি এসব তার কুঞ্জদাই জোগাড় করেছে ? কিন্তু তা-ই বা কেমন করে হবে ? আদার ব্যাপারী তার দাদার এসব জাহাজের খবরের দরকার কি ?

কাগজগুলো যথাস্থানে রেখে দিয়ে আবার বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে রাজা। তার সন্দেহাকুল মনে নানা ধরনের চিন্তা। কি ব্যাপার? কে এগুলো এখানে লুকিয়ে রেখেছে?

একটু বেশী রাতে কুঞ্জবিহারী এসে হাজির হয়।

বিছানার চাদর ঝাড়তে ঝাড়তে রাজা কুঞ্জকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা কুঞ্জদা, তাকের ওপর ঐ কৌটোগুলোর মধ্যে কি আছে?

সহজ কণ্ঠে জবাব দেয় কুঞ্জ, কি আর থাকবে? আগে জিনিসপত্র রাখতাম। এখন খালিই পড়ে আছে।

রাজা আবার বললে, খুব খিদে পেয়েছিল বলে মুড়ি খুঁজতে কৌটোগুলো খুলেছিলাম। মুড়ি চিঁড়ে না পেলেও আর একটা জিনিস কিন্তু পেয়েছি একটা কৌটোর মধ্যে।

—কি জিনিস? কুঞ্জর চোখে কৌতূহল।

রাজা মুখে কোন জবাব না দিয়ে কৌটোটা নামিয়ে এনে ভেতর থেকে কাগজপত্রগুলো বের করে কুঞ্জর সামনে মেলে ধরে।

কাগজপত্রের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে একটা শঙ্কার ছায়া ছড়িয়ে পড়ে কুঞ্জর চোখে। একি সর্বনেশে ব্যাপার! কে রাখলে এসব এখানে?

রাজা আবার বললে, বাড়িওয়ালী মাসীমার মুখে শুনলাম বিকেলে মনোরঞ্জনদা নাকি তোমার ঘর খুলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে গেছে।

—মনোরঞ্জন? মনোরঞ্জন গ্যাংটক থেকে এসেছিল নাকি?

—তাই তো শুনলাম। আমার তো মনে হয় একাজ ঐ মনোরঞ্জনদাই করেছে। তাকিয়ে দেখ, ম্যাপের ব্লু প্রিণ্ট গ্যাংটক হেডকোয়ার্টারের।

ম্যাপটা পরীক্ষা করতে করতে কুঞ্জ বললে, তাই তো দেখছি। মনে হয় মনোরঞ্জনই বিশেষ কোন প্রয়োজনে এগুলো এখানে লুকিয়ে রেখে গেছে।

—আমার তো মনে হয় মনোরঞ্জনদা বোধহয় এই সব গোপনীয় কাগজপত্র নিয়ে এসে কারুর হাতে পয়সার বিনিময়ে তুলে দেয়।

—আমি অবশ্য তোর মত অতটা ভাবতে পারছি না, বলতে

থাকে কুঞ্জবিহারী, তবে এখানে থাকতে মনোরঞ্জনের চালচলন মাঝে মাঝে কেমন যেন রহস্যময় ঠেকতো। তা যাক গে, এবার বল, এগুলো নিয়ে এখন কি করবো?

—কি আর করবে? বলতে থাকে রাজা, এগুলোকে এখনই বিদেয় করা উচিত। এমন বিপদজনক জিনিস ঘরে রাখার অর্থ বিপদ ডেকে আনা।

আঙ্গুল দিয়ে কাগজগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে গভীরভাবে কি যেন ভাবতে থাকে কুঞ্জবিহারী। অবশেষে একসময় বললে, বুঝলি রাজা, আমার মনে হয় এসব গোপন কাগজপত্র নষ্ট না করে কোথাও লুকিয়ে রাখা উচিত। আজ হোক, কাল হোক, এর মালিক একদিন এর খোঁজ করবেই।

কুঞ্জবিহারীর কথাটা ঠিক মনঃপুত না হওয়ায় রাজা একটু সময় চুপ করে থেকে অবশেষে বললে, বেশ তো, তাই না হয় হলো। কিন্তু এসব লুকিয়ে রাখবে কোথায়?

আবার একটু চিন্তা করে কুঞ্জবিহারী হঠাৎ উৎসাহিত কণ্ঠে বলে ওঠে, ঠিক আছে। লুকিয়ে রাখার একটা ভাল জায়গার কথা মনে পড়েছে।

—কোথায়? জিজ্ঞেস করে রাজা।

জবাব দেয় কুঞ্জ, বালিশের মধ্যে।

অবশেষে রাজা ও কুঞ্জ বালিশের খোল কেটে তার মধ্যে ঐ কাগজপত্রগুলো রেখে দিয়ে বালিশের খোল আবার এমনভাবে সেলাই করে দেয় যে হঠাৎ বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় থাকে না।

পরের দিন সন্ধ্যায় মনোরঞ্জন যখন এসে উপস্থিত হয় তখনও কুঞ্জবিহারী ও স্বপনের ঘর তালাবন্ধ। কুঞ্জ তখনও ফেরে নি, আর রাজা গিয়েছিল বাজারে।

মনোরঞ্জন যথারীতি সুন্দরী বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে কুঞ্জর ঘরে ঢুকে সন্তর্পণে বন্ধ করে দেয় দরজা। তারপর সেই বিশেষ কৌটোটা খুলে লুকিয়ে রাখা 'মাল' বের করতে গিয়েই হতভম্ব। কাগজপত্রের চিহ্নমাত্র নেই কৌটোর মধ্যে।

মাথায় আকাশ ভেঙে পরে মনোরঞ্জনের। ঐ কাগজপত্রগুলো পাশের ঘরের স্বপনের হাতে তুলে দিতে পারলেই যে হাতে

আসতো মোটা টাকা। ঐ টাকা দিয়ে সে কি করবে তার একটা মোটামুটি ছক্‌ও যে সে করে ফেলেছিল শিলিগুড়ি আসার পথে। পার্বত্য এলাকা গ্যাংটকে ভালো জিনিস প্রায় পাওয়াই যায় না, আর গেলেও অনেক দাম। তাই সে ভেবেছিল ঐ টাকায় শিলিগুড়ি থেকে কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস সে কিনে নিয়ে যাবে। তার চাইতেও বড় কথা, ঐ কাগজপত্র অন্য কারুর হাতে পড়লে মনোরঞ্জনের বিপদ ঘটতে পারে।

পাগলের মত একটার পর একটা কৌটো খুঁজতে থাকে মনোরঞ্জন। কিন্তু হা-হতোস্মি, কোথায় কাগজপত্র? অবশেষে খবরের কাগজের স্তূপ, তোষকের নীচ প্রভৃতি সম্ভাব্য জায়গাগুলো একের পর এক পরীক্ষা করেও কিন্তু মেলে না কোন হদিশ। সবশেষে সে স্থির সিদ্ধান্তে আসে যে একাজ কুঞ্জবিহারীর। চোরের উপর বাটপাড়ি করেছে সে।

একটু পরেই বাড়ি ফেরে রাজা। তরকারীর ঝুলিটা নামিয়ে রেখে মনোরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, কতক্ষণ এসেছেন দাদা?

মনোরঞ্জন সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, জানো রাজা, কাল বিকেলে এই ঘরে কয়েকটা জরুরী কাগজপত্র রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না সেগুলো।

—এই ঘরে? কোথায়?

তাকের ওপরের ঐ কৌটোগুলোর একটার মধ্যে রেখেছিলাম কিন্তু—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় মনোরঞ্জন।

বলে ওঠে রাজা ভারি আশ্চর্য তো!

ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ি ফেরে কুঞ্জবিহারী। রাজার শেষ কথাটা কানে যেতেই সে বলে ওঠে, কি আশ্চর্য ব্যাপার রে রাজা? কিসের কথা বলছিস?

রাজা কিছু জবাব দিতে যায়, কিন্তু তার আগেই মনোরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে হেসে কুঞ্জবিহারী বলে ওঠে, এই যে এসে পড়েছ দেখছি। তুমি আজ আসবে বলেই তো তাড়াতাড়ি ফিরলাম। তা, এবার কি খাবে বলো?

কাগজত্র হারানোর শোকে ম্রিয়মান হবার বদলে মাথার মধ্যে তখন আগুন জ্বলছিল মনোরঞ্জনের। এর সঙ্গে কুঞ্জ জড়িত, এই

ধারণাটা সেই মুহূর্তে তাকে বিমুখ করে তুলেছিল কুঞ্জর ওপর। তাই কুঞ্জর কথায় কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে, তোমার এখানে আমি খেতে আসি নি।

কুঞ্জ পরিহাস তরল কণ্ঠে বলে ওঠে, তবে এখনও জানতে পারিনি কেন এসেছ।

—এসেছি কতগুলো দরকারী কাগজপত্র নিয়ে যেতে। ঐগুলো আমিই কাল বিকেলে তোমার এখানে রেখে গিয়েছিলাম।

—কোথায় রেখেছিলে?

—ঐ তাকের ওপরের একটা কৌটোর মধ্যে।

—কৌটোর মধ্যে দরকারী কাগজপত্র! সেকি?

—হ্যাঁ, একটু বেশি সাবধান হতে গিয়েই—। কথাটা শেষ করে না মনোরঞ্জন।

—ভালো করে খুঁজে দেখেছ?

—না দেখে কি বলছি? কেউ নিশ্চয়ই সরিয়েছে।

—কে আর সরাবে? আমার এখানে আমি আর রাজা ছাড়া আর কেউ তো নেই।

—তা'হলে তোমাদের মধ্যেই কেউ সরিয়েছে।

—কী এমন কাগজপত্র যে আমরা সরাবো?

—যে কাগজপত্রই হোক না, নিশ্চয়ই এ কাজ তোমাদের।

বন্ধুত্বের কথা ভুলে কুঞ্জ দৃঢ় কণ্ঠে বললে, দেখ মনোরঞ্জন, আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমারই ওপর এমনি দোষারোপ অন্যায়।

—আর, তুমি যে আমার কাগজপত্র চুরি করেছো তা বুঝি খুব ন্যায়সঙ্গত কাজ?

মনোরঞ্জনের কথার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় কুঞ্জবিহারীর। চড়া সুরে সে বললে, আমাকে যে চোর বলছো, দেখেছো কি আমাকে চুরি করতে?

—চোর কি কখনও দেখিয়ে চুরি করে?

—আমি চোর? বেশ, তাই হোক্। আমিই চুরি করেছি। বেশ করেছি। কি করবে তুমি আমার?

কেউ কিছু বুঝবার আগেই হঠাৎ মনোরঞ্জন দু'পা এগিয়ে গিয়ে কুঞ্জর চোয়ালে একটা ঘুসি বসিয়ে দেয়। আচমকা আক্রমণে হতচকিত কুঞ্জ 'উঃ' বলে একটা শব্দ করে সেখানেই বসে পড়ে।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত রাজা ছুটে আসে কুঞ্জর সাহায্যে। কিন্তু কুঞ্জ তাকে সরিয়ে দিয়ে বললে, সাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। সেই সাপ ছোবল মেরেছে।

সেই মুহূর্তে স্বপন সবে বাড়ি ফিরেছে। পাশের ঘরে গোলমাল শুনে সে এসে দাঁড়ায় দরজার কাছে। কুঞ্জবিহারী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। একপাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মনোরঞ্জন। চোখাচোখির মাধ্যমে ইঙ্গিত বিনিময় হয় মনোরঞ্জন ও স্বপনের মধ্যে। স্বপন তাকায় কুঞ্জর দিকে। জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে কুঞ্জবাবু? গোলমাল কিসের?

—কিছু না। গায়ের জামা খুলতে খুলতে কুঞ্জ জবাব দেয়।

স্বপন আরও একটু সময় দাঁড়ায়। তারপর কিছু না বলে চলে যায় নিজের ঘরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করে মনোরঞ্জন।

॥ পনেরো ॥

ফিফ্‌থ কোলামিস্ট—পঞ্চম বাহিনী—ঘরশত্রু বিভীষণ। যুগে যুগে দেশে দেশে এই বিভীষণদের অস্তিত্ব। এদের কৌশলে কত রাজা রাজ্য হারিয়েছে, কত জাতি হারিয়েছে তার ঐতিহ্য, কত দেশ হয়েছে অন্যের পদানত।

১৯৩৬ সাল। বিশ্বইতিহাসের একজন ধুরন্ধর ডিক্‌টেটর স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কো তাঁর সৈনবাহিনীর চারটি 'কোলাম' অর্থাৎ চারটি দলের সাহায্যে অবরোধ করে রেখেছেন রাজধানী মাদ্রিদ। অবশেষে 'পঞ্চম কোলাম' অর্থাৎ রাজধানীর বিভীষণেরা তৎপর হয়ে উঠতেই পতন ঘটলো মাদ্রিদের। সেই থেকেই সারা বিশ্বে এর অস্তিত্ব চিরকালই আছে এবং সম্ভবত চিরকালই থাকবে। স্বাধীন ভারতের খোদ সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই রয়েছে তাদের অস্তিত্ব।

৩৬ নম্বর মারাঠা লাইট রেজিমেন্ট। শিলিগুড়ি খাপরাইলে তাদের ক্যাম্প। এই বাহিনীরই হাবিলদার অধীর কুমার ঘোষ

বেঁটে খাটো মাঝারি গড়ন। চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ, তবে তাকে বুদ্ধি না বলে বোধহয় দুর্বুদ্ধি বলাই ভালো।

স্ত্রী বিয়োগের পরে অধীর আবার বিয়ে করেছিলে মায়াকে। কোচবিহার সহরের হাসপাতালের নার্স মায়া থাকতো হাসপাতাল সংলগ্ন নার্সদের কোয়ার্টারে। স্বামী অধীরকুমার শিলিগুড়ি, আর স্ত্রী মায়া কোচবিহারে।

একে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তায় আবার চাকুরে। কাজেই অধীর কুমারকে প্রায়ই আসতে হতো কোচবিহার। থাকার জায়গার অভাবে মায়ার পক্ষে শিলিগুড়ি যাবার সুযোগ ছিল না। কারণ অধীর থাকতো মিলিটারী ক্যাম্পে।

কোচবিহারের মহকুমা সহর দিনহাটা। সেই দিনহাটা থেকে একদিন অধীর ফিরছিল কোচবিহার। সঙ্গে স্ত্রী মায়া। শেয়ারের ট্যাক্সি। বেজায় ভীড়। চারজন সওয়ারীর জায়গায় দশ বারোজন সওয়ারীকে বহন করবার অদ্ভুত কেরামতি ড্রাইভারদের। পাশাপাশি বসেছিল ফজলুর রহমান ওরফে বড় দিলীপ, অধীর আর মায়া।

ভীড়ের চাপে মায়ার প্রায় দম বন্ধ হবার মত দশা। তার অবস্থা দেখে কেমন যেন দয়া হলো বড় দিলীপের। নিজে উঠে দাঁড়িয়ে অধীরকে বললে, আপনি আমার জায়গায় সরে বসুন। ওঁকে একটু ফাঁকায় বসতে দিন। ওঁর বোধহয় খুব কষ্ট হচ্ছে।

হাঁ হাঁ করে ওঠে অধীর, সেই সঙ্গে মিনমিনে সুরে মায়াও। অধীর বলে ওঠে, তা কি করে হয়? আপনি এতটা পথ কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন!

—তাতে কি? আমরা ব্যাটাছেলে—। বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে জবাব দেয় বড় দিলীপ। আজ একমাস ধরে অধীরের পিছে পিছে ছায়ার মত ঘুরে এরকম একটা পরিস্থিতির সুযোগই সে খুঁজছিল। কাজেই সুযোগ পাওয়ামাত্র তার সদ্ব্যবহার করতে সে ছাড়লো না। এখানকার মারাঠা লাইট রেজিমেণ্টের পুরানো লোক অধীর। একে কব্জা করে এজেণ্ট করতেই হবে। প্রসন্ন তো আছেই, তারওপর এই অধীর। এদের হাতে রাখতে পারলে আর চিন্তা নেই তার।

অধীরও নাছোড়বান্দা। একজন অপরিচিত সুশ্রী ভদ্রলোক যে তার মোটামুটি সুন্দরী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর জন্যে এভাবে স্বার্থ-ত্যাগ করবে এটা যেন তার অসহ্য। তাই সে মুখে হাসি টেনে

বললে, না—না, তা হয় না। আপনি আপনার জায়গায় বসুন।

বড় দিলীপও বসবে না, অধীরও ছাড়বে না। অবশেষে একটা রফায় এলো তারা। বড় দিলীপ বসবে অধীরের হাঁটুর ওপর।

—আপনার খুব কষ্ট হবে। আমার দেহের ওজন তো কম নয়। বড় দিলীপ বললে।

জবাবে হেসে বললে অধীর, মিলিটারী চাকরি করে যদি এটুকু কষ্ট সহ্য করতে না পারি, তাহলে বৃথাই আমার চাকরি।

রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ট্যাক্সি চলছে। নিজের হাঁটুর ওপর বড় দিলীপকে বসিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে চলছে অধীর। পরস্পরের দেহের উষ্ণ স্পর্শ পরস্পরের মনে সংক্রামিত হতেও দেরি হলো না। অবশেষে কোচবিহার পৌঁছে তারা যখন ট্যাক্সি থেকে নেমে এলো তখন অধীর ও বড় দিলীপ যেন পরস্পরের অনেক-দিনের পরিচিত।

বিদায় নেবার সময় অধীর বড় দিলীপের হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, আপনিও যখন শিলিগুড়ি থাকেন তখন একদিন আসুন না আমাদের খাপরাইলের ক্যাম্পে।

এরকম একটা আহ্বানের অপেক্ষাতেই ছিল বড় দিলীপ। মিলিটারী ক্যাম্পের কথায় যেন ভয় পেয়েছে এমন সুরে বড় দিলীপ জবাব দেয়, ওরে বাবা, মিলিটারী বলে কথা! আপনাদের ওখানে আমাকে ঢুকতে দেবে কেন?

—কোন চিন্তা নেই। গেটে আমার নাম বলবেন। সঙ্গে করে আপনাকে আমার কাছে পৌঁছে দেবে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় বড় দিলীপ। এতদিন পূর্ণ হতে চলেছে তার আশা।

কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি ফিরে আসার পথে মনে মনে আল্লাহ্‌তালাকে ধন্যবাদ জানায় বড় দিলীপ। সম্ভবত, সেই সঙ্গে মনে মনে উচ্চারণও করে—পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

দিন দশেক যেতে না যেতেই বড় দিলীপ একদিন এসে হাজির হলো অধীরের খাপরাইলের ক্যাম্পে। বললে, একটু কাজে এদিকে আসতে হয়েছিল। ভাবলাম, একবার দেখা করেই যাই।

—খুব ভালো করেছেন, হেসে বললে অধীর। মিলিটারী ক্যাম্পের জীবন। আত্মীয়-স্বজন বলতেও তেমন কেউ নেই এদিকে। তাই

পরিচিত কেউ এলে খুব ভাল লাগে।

—কেন, আপনার স্ত্রী তো মাঝে মধ্যে আসতে পারেন। শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার তো তেমন কিছু দূর নয়। বড় দিলীপ বললে।

—তা ঠিক, বলতে থাকে অধীর—তবে একা মেয়েছেলের পক্ষে এতদূর এসে আবার সেদিনই ফিরে যাওয়া খুবই কষ্টকর। একটা রাত যে এখানে থেকে যাবে তেমন কেউও তো এদিকে আমাদের নেই।

—তা বটে। কথাটা উচ্চারণ করে বড় দিলীপ মনে মনে পরিকল্পনা করতে থাকে যাতে এই লোকটিকে কোনরকমে কঠিন কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে রাখা যায়।

চা-সিঙ্গাড়া সহযোগে বড় দিলীপ অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে অধীরের সঙ্গে। তারপর এক সময় বিদায় নেয়। তবে তার আগে অধীরকে নিমন্ত্রণ করে যায় তার শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্যে।

নিমন্ত্রণ—পাল্টা নিমন্ত্রণ। এমনিভাবেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে বড় দিলীপ ও অধীরের মধ্যে। অবশেষে শুরু হয় আসল কাজ। প্রথমে বিস্ময় মেশানো ভয়, তারপর নিমরাজি, অবশেষে সম্পূর্ণ রাজি না হয়ে উপায় থাকে না অধীরের। বন্ধুত্বের দাবী বলে নিজের মনকে চোখ ঠারলেও বিষয়টি যে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক এবং সেই অর্থের লোভ ছেড়ে দেয়া যে তার পক্ষে সম্ভব নয় এটা সে অনায়াসেই বুঝতে পারে। শুরু হয় আদান প্রদান। প্রথম সংকোচের জড়তা কেটে যেতেই যেন দিব্যচক্ষু লাভ করে অধীর। অর্থলাভের যে এমন একটা সুযোগ থাকতে পারে তা সে এতকাল ধারণাই করতে পারে নি। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে দামী সব গোপন তথ্য, প্রচুর কাগজ-পত্র, ম্যাপ ও ব্লু প্রিন্ট।

ওপারে দিনাজপুরের সার্ভে সাহেব মেজর লতিফ তো খুব খুশি। এজেন্ট তো নয়, একটি দামী রত্ন। এই রত্নটি যেন কোনক্রমেই হাতছাড়া না হয়। সেই মর্মে সে নির্দেশ পাঠায় বড় দিলীপকে—খুব সাবধানে হ্যাণ্ডল করবে এই দামী এজেণ্টটিকে। প্রয়োজনে কিছু বেশিও খরচ করতে পারো এর পেছনে। তোমার কাজে ঢাকার ব্রিগেডিয়ার সাহেবও খুব খুশি।

আনন্দে বুকখানা ফুলে ওঠে বড় দিলীপের। অধীরের জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। এখন দু' হাত ভরে সে কুড়োচ্ছে সেই পরিশ্রমের ফসল।

একদিন বড় দিলীপ অধীরকে বললে, আপনাদের মিলিটারীতে তো যখন-তখন ছুটি নেয়া সম্ভব নয় যে হুট করে দুটো দিন কোচবিহার গিয়ে বৌদির কাছে কাটিয়ে আসবেন। তার চাইতে বৌদিকেই তো বলতে পারেন মাঝে মধ্যে এখান থেকে ঘুরে যেতে।

—তা হয়তো পারে, তবে থাকার জায়গারই তো সমস্যা। ম্লান মুখে জবাব দেয় অধীর।

—সেকি, থাকার আবার সমস্যা কোথায়? কৃত্রিম বিস্ময়ে বলতে থাকে বড় দিলীপ, আপনি তো দেখছেন, আমার শ্বশুরবাড়িতে অনেকগুলো ঘর। ইচ্ছে করলে বৌদি তো যে ক'দিন ইচ্ছে এখানে এসে থাকতে পারেন।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গসুখ লাভে উন্মুখ অধীরের কাছে এটা এক লোভনীয় প্রস্তাব। তবে মায়া এতে রাজি হবে কিনা কে জানে?

প্রথমটায় মায়া রাজি হয় নি। অবশেষে একদিন খোদ বড় দিলীপ অধীরের সঙ্গে কোচবিহার গিয়ে মায়াকে অনুরোধ করে এসেছিল। কাজ হয়েছিল সেই অনুরোধে। এসেছিল মায়া। একটা রাত কাটিয়ে গিয়েছিল সে বড় দিলীপের বাড়িতে। অনুভাকেও ভালো লেগেছিল তার। তবে সবচাইতে বেশি ভালো লেগেছিল অনুর ছেলেকে।

শুরু হলো যাতায়াত। প্রথম পরিচয়ের সংকোচ কেটে যেতেই হাসপাতালের নার্স নিঃসন্তান মায়া ছুটি-ছাটায় এসে হাজির হতে লাগলো শিলিগুড়ি। অধীরও একটা রাতের ছুটি নিয়ে এসে কাটায় বড় দিলীপের বাড়িতে। কার্যোদ্ধারের আনন্দে বড় দিলীপ তৃপ্ত।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাস। আগরতলার ধলেশ্বরে স্ত্রী অনিতা ও শালী পুষ্পকে নিয়ে ভালই দিন কাটছে ছোট দিলীপ ওরফে নূর ইসলামের। কয়েকজন এজেন্টও সে ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে ফেলেছে। তাদের মাধ্যমে কাজকর্মও ভালই চলছে তার।

গুপ্তচরবৃত্তির কাজে আগরতলার সুবিধে অনেক। এই সহরের প্রায় গা-ঘেঁসেই পূর্ব পাকিস্তানের আধাউড়া এলাকা। কাজেই বর্ডার পার হয়ে যাতায়াত করা এখানে কোন সমস্যাই নয়। তাছাড়া বর্ডার দালালেরা তো সর্বদাই প্রস্তুত।

হঠাৎ একদিন নূরের কাছে খবর এলো একটা বিশেষ কাজে দিনাজপুরের মেজর লতিফ এসেছে আখাউড়া। উঠেছে সেখানকার ডাকবাংলোয়। সে দেখা করতে চায় নূরের সঙ্গে।

বর্ডার পার হয়ে একদিন সন্ধ্যায় নূর এসে হাজির হতেই মেজর লতিফ জিজ্ঞেস করে, ঢাকায় গিয়ে শিকদারের সঙ্গে দেখা করার হুকুম পেয়েছ?

—না তো। বিস্মিত কণ্ঠস্বর নূরের।

—না পেলেও আজ কালের মধ্যেই পাবে। দেরি করবে না। যত তাড়াতাড়ি পারো ঢাকা চলে যাবে।

চিন্তিত কণ্ঠে নূর জিজ্ঞেস করে, কেন ডেকেছেন জানেন নাকি, স্যার?

জবাব দেয় মেজর লতিফ, সঠিক জানি না। তবে মনে হয় তোমাকে বোধহয় অন্য কোথাও পাঠানো হবে।

—কোথায় স্যার, শিলিগুড়ি? আগ্রহ ফুটে ওঠে নূরের কণ্ঠে।

নিজের জন্মস্থান বলে নয়, শিলিগুড়ি জায়গাটা বাস্তবিকই নূরের ভালো লেগেছিল। সেখানে আব্দুল করিম ও ফজলুর রহমানের সঙ্গে কাজ করে বেশ আনন্দই পেয়েছিল সে। এখন অবশ্যি তার কাজের ধারার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সেদিন সে ছিল তাদের 'ক্যুরিয়ার' অর্থাৎ দূত। কাগজপত্র ও খবরাখবর ওপারে পৌঁছে দেয়াই ছিল তার কাজ। আর, আজ সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ঐ আব্দুল ও ফজলুরের মত নিজেই গোপন কাগজপত্র জোগাড় করে এজেন্ট মারফত।

—কেন, শিলিগুড়ি যেতে ইচ্ছে নেই নাকি তোমার? মেজর লতিফের কটা চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

জবাব দেয় নূর, না স্যার, সেখানে যেতে পারলে তো ভালই হয়। পুরানো জায়গা।

হাতের আমেরিকান সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে মেজর লতিফ আবার বললে, সে যাই হোক। তুমি সেখানে গেলেই জানতে পারবে।

আগরতলায় ফিরে এসে খবরটা বলতেই অনিতা মুখ ভার করে বললে, এখানে এসে একটু স্থির হয়ে বসতে না বসতেই আবার যেতে হবে অন্য জায়গায়?

—মেজর সাহেব তো তাই বললেন।

—কী যে তোমাদের কাজের ধারা, বুঝি না বাপু। বিরক্ত মুখে কথাটা বলে সেখান থেকে উঠে যায় অনিতা।

শ্যালিকা পুষ্প ভগ্নিপতির মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যেতে হবে, জামাইবাবু?

—তা তো এখনও জানি না। দেখা যাক, কোথায় পাঠায়।

যথারীতি নূরের কাছে ঢাকা যাবার নির্দেশ এলো। সেখানে পৌঁছে 'শিকদার' অর্থাৎ সার্ভে সেকশনের ব্রিগেডিয়ার সেলিমের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি বললেন, এই যে এসে গেছ তুমি। তোমাকে এবার ব্যারাকপুর যেতে হবে।

—ব্যারাকপুর? কোন্ ব্যারাকপুর? জিজ্ঞেস করে নূর।

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেন ব্রিগেডিয়ার সেলিম, কলকাতার কাছে ব্যারাকপুর নামে যে একটা জায়গা আছে সেখানে আছে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটা বড় কেন্দ্র। তা'ছাড়া খড়গপুরের কাছে কলাইকুণ্ডাতেও আছে আর একটা ঘাঁটি। ওখানকার খবরাখবর জোগাড় করে তোমাকে পাঠাতে হবে। কাজটা বেশ কঠিন, তাই ভেবে চিন্তে তোমাকেই এই দায়িত্ব দেব বলে ঠিক করেছি।

কাজটা যে কঠিন তা নূর নিজেও বুঝতে পারে। এ শিলিগুড়ি কিম্বা আগরতলা নয়, এ হচ্ছে খোদ কলকাতা। তার ওপর খবর জোগাড় করতে হবে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের।

শিকদার সাহেবের কথায় মনে মনে একটু খুশিও হয় নূর। শক্ত কাজের দায়িত্ব তার ওপর দেয়া মানেই তার কর্মক্ষমতার স্বীকৃতি। তাই সে জিজ্ঞেস করে, কবে যেতে হবে, স্যার?

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, জবাব দেন ব্রিগেডিয়ার সেলিম. ওখানে প্রাথমিক খরচ-খরচার জন্যে হাজার দুয়েক টাকা দেয়া হবে তোমাকে। তা'ছাড়া ভাল এজেন্ট জোগাড় করতে পারলে টাকা তো আছেই। তবে একটা কথা, খুব সাবধানে কাজ করতে হবে সেখানে। পদে পদে বিপদ। একটু অসতর্ক হলেই ঘোরতর বিপদে পড়বে।

একটু সময় চিন্তা করে নূর আবার জিজ্ঞেস করে, এপারে কার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে আমার? দিনাজপুরে মেজর সাহেবের সঙ্গে?

—না-না, বলে ওঠেন সেলিম, বর্ডার পার হলেই আমাদের যশোহর। সার্ভে সেকশনের যে মেজর সেখানে আছেন তাঁর সঙ্গেই থাকবে তোমার যোগাযোগ। যখন তখন তোমাকে আর বর্ডার পারাপার করতে হবে না। একজন ক্যুরিয়ার পাবে তুমি। তার মারফতই তুমি যোগাযোগ রাখবে।

এতক্ষণে নূরের মনে হয় সে যেন সত্যিই এবার জাতে উঠেছে। লেখাপড়া না শিখলেও তার কদর বেড়েছে অনেক। একদিন সে নিজেই ছিল ফজলুর রহমান ও আব্দুল করিমের ক্যুরিয়ার। তাদের দেয়া কাগজ পত্র বর্ডার পার হয়ে পৌঁছে দেয়াই ছিল তার কাজ। আজ সে নিজেই পাবে তেমনি একজন লোক।

১৯৬৯ সালের মে মাস। ব্যারাকপুরের লালকুঠির কাছে ঘোষপাড়া। এই ঘোষপাড়াতেই পঞ্চাশ টাকার একখানা ভাড়া-বাড়িতে এসে উঠলো নূর ইসলাম ওরফে ছোট দিলীপ। সঙ্গে স্ত্রী অনিতা ও শ্যালিকা পুষ্প। ব্যারাকপুর এয়ারড্রোমের কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ এই ঘোষপাড়াতেই বাসা নিয়ে থাকে। তাদের মধ্য থেকে কাউকে এজেন্ট হিসেবে বেছে নিতে সুবিধে হবে বলেই এখানে এসে আশ্রয় নিলে নূর ইসলাম। আর সহকারী হিসেবে ক্যুরিয়ারের কাজ করতে তার কাছে যে যুবকটি এলো তার নাম খোকন ওরফে বিমল রায় ওরফে রফিকুদ্দিন আমেদ।

কুঞ্জবিহারীকে ঘুঁসি মেরে গায়ের ঝাল মেটালেও মনোরঞ্জনের আফশোষ ঐ কাগজপত্রগুলো স্বপনের হাতে তুলে দিতে পারলে মোটা টাকা হাতে আসতো তার। এ থেকে কুঞ্জ তাকে বঞ্চিত করেছে। কে জানে হয়তো সে নিজেই এগুলো বড় দিলীপের হাতে তুলে দিয়ে মোটা টাকা কামিয়েছে। হয়তো স্বপনের ওপর চোখ রাখার জন্যে বড় দিলীপ নিজেই কুঞ্জবিহারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাকে এখানে রেখে গেছে। অসম্ভব কিছুই নয়। এ লাইনে সবই সম্ভব।

সেদিন শিলিগুড়ি থেকে নিজের কর্মস্থল গ্যাংটক ফিরে যাবার পথে এই ধরনের কথাই ভাবছিল মনোরঞ্জন। সহসা একটা কথা মনে হতে দারুণ চমকে ওঠে সে। এতদিন তার এই কাজের কথা

একমাত্র স্বপন ও বড় দিলীপ ছাড়া আর কেউ জানতো না। এমনকি নিজের স্ত্রীর কাছেও সে গোপন রেখেছিল ব্যাপারটা। আজ কিন্তু আর তা গোপনীয় নেই। অন্তত একজন ঐ কুঞ্জবিহারী সবকিছু জানতে পেরেছে। ইচ্ছে করলে এখন সে অনায়াসেই তাকে বিপদে ফেলতে পারে।

কথাটা মনে হতেই অনুশোচনা জাগে মনোরঞ্জনের মনে। রাগের মাথায় কুঞ্জবিহারীকে ঘুসি মেরে সে ভালো করে নি। এখন কুঞ্জ যদি সব প্রকাশ করে দেয় তা'হলে মনোরঞ্জনের পায়ের নীচে মাটি থাকবে না। চাকরি তো যাবেই, কোর্ট মার্শালের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে।

এখন কিছুদিন চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। একেবারে চুপচাপ থাকবে। দেখা যাক জল কতদূর গড়ায়।

স্বপন একদিন মনোরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে এলে মনোরঞ্জন তাকে বললে, এখন কিছুদিন ভালো মানুষ সেজে বসে থাকবো বলে ঠিক করেছি।

—সেকি? বিস্মিত কণ্ঠস্বর স্বপনের, কাজকর্ম লাটে তুলে দেবেন?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মনোরঞ্জন বললে, আপাতত তাই। এমনকি এখন কিছুদিন আপনিও আমার সঙ্গে দেখা করতে এখানে আসবেন না। সাবধানের মার নেই।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু—। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠস্বর স্বপনের।

বলে ওঠে মনোরঞ্জন, উপায় নেই। কিছুদিন চুপ করে থাকতেই হবে। ধরা পড়লে একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাবো। এটা নিশ্চয়ই আপনি চান না।

ম্লান মুখে কেবল চুপ করে থাকে স্বপন।

আশ্বাসের সুরে মনোরঞ্জন আবার বললে, দেখা যাক কি হয়। তেমন কিছু ভালো মাল জোগাড় করতে পারলে অন্যের মারফত আপনার কাছে পাঠাবো। আমি নিজে আর কিছুদিন আপনাদের ওখানে যাচ্ছি না। ঐ কুঞ্জটাই সবকিছু গোলমাল করে দিলে।

অবশেষে এই ব্যবস্থাতেই রাজি হয়ে খালি হাতে গ্যাংটক থেকে শিলিগুড়ি ফিরে আসতে হলো স্বপনকে। সত্যিই তো, এই কাজের জন্যে মনোরঞ্জন তো তার চাকরিটি খোয়াতে পারে না।

মনে মনে যতই কেন না স্থির করুক, বাঘ কি কখনও নর রক্তের

স্বাদ ভুলতে পারে? কয়েক খানা দামী কগজপত্র হাতে আসতেই মনোরঞ্জনের মনটা আবার উস্‌খুস করতে থাকে। এ জাতীয় কাগজপত্র মানেই টাকা। এগুলো কোনরকমে স্বপনের হাতে তুলে দিতে পারলেই মোটা টাকা হাতে আসবে।

অবশেষে মনোরঞ্জন ঠিক করে এই 'মাল' সে অন্য কারুর মারফৎ স্বপনের কাছে পাঠাবে। কিন্তু তেমন কোন বিশ্বাসী লোকই যে তার চোখে পড়ে না। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে সে ঠিক করে নিজের স্ত্রীকে সে পাঠাবে শিলিগুড়ি।

মনোরঞ্জনের স্ত্রী তেমন লেখাপড়া জানে না। বাংলা একটু-আধটু জানলেও ইংরেজি একেবারেই পড়তে পারে না। মনোরঞ্জনের দেয়া কাগজের প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে করতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, এর মধ্যে কি আছে গো?

একটা ঢোক গিলে জবাব দেয় মনোরঞ্জন, না, তেমন কিছু না। কয়েকটা জরুরী কাগজ মাত্র। তবে, খুব সাবধান, কেউ যেন দেখতে না পায়। গোপনে এটা স্বপনবাবুর হাতে দিয়ে রাতটা রূপাদের ওখানে থাকবে; কাল সকালেই আবার ফিরে আসবে।

স্বামীর কথায় কেমন যেন সন্দেহ হয় মহিলার। একবার তেমন কিছু না, আবার বলছে জরুরী কাগজ, খুব গোপনে স্বপনের হাত দিতে হবে।

হাঁটু দুলিয়ে কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে মনোরঞ্জনের স্ত্রী কাগজের প্যাকেটটা খুলে ফেলতেই হা-হা করে ওঠে মনোরঞ্জন। বলে ওঠে, ওকি, খুলছো কেন?

স্বামীর কথায় মহিলা মনোরঞ্জনের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললে, কেন কী হয়েছে? যে জিনিস আমাকে নিয়ে যেতে হবে তা' একবার দেখলেও দোষ?

—না না, দোষের কথা নয়, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে মনোরঞ্জন, বলছিলাম যে কাগজগুলো ইংরেজিতে লেখা। তুমি বুঝতে পারবে না।

—না পারি, একবার না হয় চোখের দেখাই দেখলাম।

বাস্তবিকই তাই। কাগজগুলো নাড়াচাড়া করেও কিছুই বুঝতে পারলে না মনোরঞ্জনের স্ত্রী। ইংরেজিতে ছাপানো কতগুলো

পুস্তিকা ও নীল কাগজের ওপর আঁকা একটা ব্লু প্রিন্ট।

কোলের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মনোরঞ্জনের স্ত্রী যখন শিলিগুড়ি এসে হাজির হয় তখনও সন্ধ্যা হয় নি। সুন্দরী বাড়িওয়ালীর বাড়ির সামনে রিক্সা থেকে নামতেই রূপা বলে ওঠে, আরে বৌদি যে। হঠাৎ কোত্থেকে এলেন?

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মনোরঞ্জনের স্ত্রী জবাব দেয়, কোত্থেকে আবার? গ্যাংটক থেকে।

—সঙ্গে কে এসেছে? দাদা?

—না রে, একাই এসেছি। তোর দাদার কি আর সময় আছে?

—গ্যাংটক থেকে একা এখানে এসেছেন বেড়াতে? বিশ্বাস হয় না কথাটা, বলেই রূপা মুখ টিপে হাসে।

রূপার গাল টিপে আদর করে হেসে জবাব দেয় মনোরঞ্জনের স্ত্রী, ঠিক ধরেছিস। স্বপনবাবুর কাছে ওঁর একটা দরকারী চিঠি নিয়ে এসেছি।

—তাই বলুন। বেড়াতে আসেন নি।

—না রে না, রথ দেখা কলা বেচা দুটো কাজের জন্যেই এসেছি। তা, এবার বল, তোর মা কোথায়?

—মা একটু বড় মাসীর বাড়ি গিয়েছে। এখনই ফিরবে। তা, আজকের রাতটা এখানে থাকছেন তো বৌদি?

—না থেকে উপায় কি বল? এই রাতে তো আর একা গ্যাংটক ফিরে যেতে পারি না।

ছোট্ট ছেলেটিকে বুকে চেপে রূপা বলে ওঠে, ইস্, কাল যেতে চাইলেই যেন যেতে দিচ্ছি।

হেসে বলে ওঠে মনোরঞ্জনের স্ত্রী, তা'হলে তোর দাদা আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

রাতে মনোরঞ্জনের স্ত্রী স্বপনের ঘরে এসে দেখে যে তখনও স্বপন বাড়ি ফেরে নি। হঠাৎ সে লক্ষ্য করে কুঞ্জবিহারীর ঘরে আলো জ্বলছে। এত তাড়াতাড়ি কুঞ্জবিহারী বাড়ি ফিরেছে নাকি? কিন্তু আগে তো তার বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হতো।

আগে হলে মনোরঞ্জনের স্ত্রী হয়তো কুঞ্জর দরজায় দাঁড়িয়ে ঠাট্টা করে বলে উঠতো, কি মশাই, কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছেন নাকি? এখানে থাকতে কুঞ্জর সঙ্গে তেমনই একটা সম্পর্ক ছিল তার। কিন্তু

মনোরঞ্জনের কাছে সে শুনেছিল কি একটা ব্যাপারে যেন তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। কাজেই স্বামীর সঙ্গে যার ঝগড়া তার সঙ্গে যেচে গিয়ে দেখা করা চলে না।

মনোরঞ্জনের স্ত্রী ফিরে আসার জন্যে পা বাড়াতেই কুঞ্জর ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে রাজা। মনোরঞ্জনের স্ত্রীকে দেখেই রাজা সোৎসাহে বলে ওঠে, আরে বৌদি যে, গ্যাংটক থেকে কবে এলেন?

মৃদু হেসে জবাব দেয় মনোরঞ্জনের স্ত্রী, এই তো কিছুক্ষণ আগে। তা, তোমার খবর কি?

—আমার আর খবর কি? বলতে থাকে রাজা, আগেও যা দেখেছেন এখনও তাই। টো-টো করে চাকরির জন্যে ঘুরে বেড়াই, আর মাঝে মধ্যে ছুট করে দাদার এখনে এসে হাজির হই।

—তোমার দাদা এখনও ফেরে নি? জিজ্ঞেস করে মনোরঞ্জনের স্ত্রী।

—এত তাড়াতাড়ি? বলেই হেসে ওঠে রাজা, দাদার ফিরতে ফিরতে অনেক রাত। তা, আপনারা সবাই কেমন আছেন?

—ভালো। সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় মনোরঞ্জনের স্ত্রী।

একটু সময় কি যেন চিন্তা করে রাজা। তারপর দু'পা এগিয়ে এসে খাটো গলায় বললে, কুঞ্জদার সঙ্গে মনোরঞ্জনদার ঝগড়ার কথা শুনেছেন বোধহয়?

—হ্যাঁ ভাই, শুনেছি। কিন্তু জানতে পারিনি কি নিয়ে সেই ঝগড়ার সূত্রপাত।

—কয়েকখানা কাগজ নিয়ে। কথাটা বলেই মুখ টিপে হাসে রাজা।

রাজার সেই হাসিটুকু কিন্তু নজর এড়ায় না মনোরঞ্জনের স্ত্রীর। কৌতূহল বেড়ে ওঠে তার। জিজ্ঞেস করে, কি এমন কাগজ যা নিয়ে ওদের মধ্যে এমন গণ্ডগোল হলো?

—কি সব নাকি মিলিটারী কাগজপত্র, ব্লু-প্রিন্ট—।

কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ থেমে যায় রাজা। নিজের বোকামীর জন্যে নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়। মনোরঞ্জনকে সেদিন সে বলেছিল যে কৌটোর মধ্যে রাখা কাগজপত্র সে চোখেই দেখেনি।

নিজেকে সংশোধন করতে গিয়ে রাজা আবার বললে, আমি ঠিক জানি না বৌদি। মনোরঞ্জনদাই যেন সেদিন একথা বলেছিল।

মনোরঞ্জনের স্ত্রী একটু সাদাসিধে হলেও বোকা নয়। রাজার কথায় কৌতূহল বেড়ে ওঠা ছাড়া কমে না তার। স্বামীর দেয়া কাগজপত্রগুলো তখনও ছিল তার নিজের জামার মধ্যে। এগুলোও যে মিলিটারী কাগজ সেটুকু অন্তত সে বুঝতে পেরেছিল। এখানে থাকতেও তার স্বামী এ ধরনের কাগজপত্র মাঝে মধ্যে নিয়ে আসতো, কিন্তু তা নিয়ে সে নিজে কোনদিন মাথা ঘামায় নি। স্বপন বাবুর সঙ্গে তার স্বামীর ঘনিষ্ঠতা নিয়েও কোনদিন তেমন কিছু চিন্তা ভাবনা করে নি সে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে রাজার কথায় কেমন যেন একটা বিশ্রী সন্দেহের কাঁটা তার মনকে খোঁচা দিতে লাগলো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মনোরঞ্জনের স্ত্রী আবার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ভাই, ব্লু প্রিন্ট জিনিসটা কি?

হালকা সুরে জবাব দেয় রাজা, কি জানি? হয়তো ম্যাপ-ট্যাপ হবে?

—নীল কাগজের ওপর আঁকা? আবার মনোরঞ্জনের স্ত্রীর প্রশ্ন।

রাজা জবাব দেয়, বোধহয় তাই।

—এইসব কাগজ বুঝি খুব গোপনীয়?

—মিলিটারী কাগজপত্র তো গোপনীয় হবেই।

রাজার কথায় মনের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় মনোরঞ্জনের স্ত্রীর। সঠিক কিছু বুঝতে না পারলেও এটুকু অন্ততঃ সে বুঝতে পারে যে তার স্বামী মনোরঞ্জন এসব গোপনীয় মিলিটারী কাগজপত্র নিয়ে কোনকিছুর সঙ্গে অন্যায়ভাবে জড়িত এবং এর সঙ্গে যোগা-যোগ রয়েছে ঐ স্বপনবাবুর। তার নিজের জামার মধ্যে রয়েছে ঐ ধরনের কাগজপত্র যা নাকি স্বপনবাবুর হাতে তুলে দেবে বলে সে গ্যাংটক থেকে বয়ে এনেছে।

সন্দেহহীন মন অনেক স্পষ্ট জিনিসও যেমন দেখতে পায় না তেমনি সন্দেহাকুল মনে অনেক অস্পষ্ট জিনিসও স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। সেদিন রাতে কাগজপত্রগুলো স্বপনের হাতে তুলে না দিয়ে নিজের কাছেই রেখে দিলে মনোরঞ্জনের স্ত্রী। রাতে বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছিল না তার। এখানে থাকতে তার

স্বামীর সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল স্বপনের। তাদের মধ্যে পয়সা কড়ির আদান প্রদানও সে লক্ষ্য করতো। কিন্তু সেদিন সে এর মধ্যে কোন অন্যায় দেখতে পায় নি। টানাটানির সংসারে এটাকে ধার-দেনা বলেই মনে করতো সে। কিন্তু আজ যেন গোটা ব্যাপারটাই অন্য একটা অর্থ নিয়ে দেখা দিয়েছে তার সামনে। সেই অর্থ অস্পষ্ট হলেও নিদারুণ বিশ্রী, কুয়াশার জালে ঘেরা থাকলেও, ভয়ানক বিপদজনক।

মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা নিয়ে সারা রাত বিছানায় ছটফট করে মনোরঞ্জনের স্ত্রী। একপাশে ঘুমুচ্ছে তার ছেলে, অন্যপাশে গভীর নিদ্রায় অচেতন বাড়িওয়ালীর মেয়ে রূপা। অবশেষে শেষ রাতের দিকে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মনোরঞ্জনের স্ত্রী।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রূপা জিজ্ঞেস করে মনোরঞ্জনের স্ত্রীকে, রাতে ঘরের মধ্যে কাগজ পুড়িয়েছিলেন নাকি বৌদি ?

ম্লান হেসে ঢোক গিলে জবাব দেয় মনোরঞ্জনের স্ত্রী, হ্যাঁ ভাই, ছেলের দুধ গরম করছিলাম।

॥ ষোল ॥

অনুভা বাপের বাড়িতেই থাকে, শেফালী মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে বাপের বাড়ি। বড় দিলীপের আসল পরিচয় প্রসন্ন জানে, সেই সূত্রে বিয়ের পর শেফালীও। কথাটা যেদিন শেফালীর কানে এলো সেদিন দিদির জন্যে মনটা ভারি হয়ে উঠেছিল তার। সাদাসিধে চরিত্রের তার দিদির ভাগ্য সত্যিই খারাপ। শেষে কিনা একটা মুসলমান বর জুটলো তার। তাও আবার নাম ভাঁড়ানো মুসলমান। একথা তাদের মা-বাবা জানতে পারলে যে কেলেঙ্কারীর একশেষে হবে, পাড়াপ্রতিবেশীরা জানতে পারলে শিলিগুড়িতে তাদের নিজেদের মুখ দেখানোই কঠিন হয়ে উঠবে।

একদিন প্রসন্ন শেফালীকে বললে, জানো, আজকাল নাকি

দিদির সঙ্গে তোমার জামাইবাবুর মোটেই বনিবনা হচ্ছে না।

জবাবে শেফালী বললে, তা তো হতেই পারে। মুসলমান ছেলে হিন্দু নাম নিয়ে হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করলে ভবিষ্যতে এরকম হওয়াই তো স্বাভাবিক। বাস্তবিকই দুর্ভাগ্য আমার দিদির। জামাইবাবু তো প্রচণ্ড ধড়িবাজ মানুষ। আমাদের বাড়িতে বিয়ের আগে এত যাওয়াআসা, কিন্তু আমরা কোনদিন ঘুণাক্ষরেও টের পাই নি যে সে হিন্দু নয়।

শেফালী থামতেই প্রসন্ন আবার বললে, তা যাই বলো, দাদা না থাকলে আমাদের এই রোজগারের পথ হয়তো বন্ধই থাকতো। তোমার গলার ঐ সীতাহার কিম্বা হাতের ঐ বালা হয়তো কোনদিনই বানিয়ে দিতে পারতাম না।

—তা ঠিক, বলতে থাকে শেফালী, তবে এজন্যে সত্যি কথা বলতে আমি পিছিয়ে যাই না। আমার জামাইবাবুটি বাস্তবিকই একটি আসল ঘুঘু।

প্রসন্ন বললে, সেদিন দাদা আমার কাছে অনেক দুঃখ করেছিল। বলেছিল, আমি যে হিন্দু নই, মুসলমান কিম্বা আমি যে নাম ভাঁড়িয়ে অনুকে বিয়ে করেছি, এতে অনু আমার ওপর যত বিরক্ত তার চাইতে বেশি বিরক্ত আমি পাকিস্তানী গুপ্তচর বলে।

প্রসন্নর কথায় শেফালীর ভ্রু-যুগল কুঁচকে ওঠে। অবিশ্বাসের সুরে সে বলল, এসব ছেঁদো কথার কোন মানে হয় না।

—ছেঁদো কথা মানে?

—তা ছাড়া আর কি? শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। জামাইবাবু চিনেছে দিদিকে। বরাবরের চাপা স্বভাবের মেয়ে দিদি। জামাইবাবুর বুঝি ধারণা হয়েছে মুসলমান হয়ে হিন্দু সেজে সে দিদিকে ঠকিয়েছে বলে দিদির তেমন দুঃখ নেই। তার যত দুঃখ জামাইবাবু পাকিস্তানী গুপ্তচর হয়ে এদেশের ক্ষতি করছে বলে?

—তা' হলে দাদা সেদিন যা বললে তা ঠিক নয়?

—আসলে সে দিদির মনের কথা টেরই পায় নি। হিন্দু মেয়ের বর মুসলমান এটা কি কম দুঃখের কথা? কিন্তু উপায় নেই। সেই স্বামীর সন্তানকেই সে পেটে ধরেছে। কাজেই মুখ বুজে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? এটাই দিদির আসল দুঃখ। দেশের ক্ষতি হচ্ছে বলে দুঃখে তার চোখে ঘুম নেই এসব একেবারে বাজে কথা।

অনুভা সম্পর্কে শেফালী এর বেশি কিছু ধারণাই করতে পারে না। নিজের মন দিয়েই সে যাচাই করেছে তার দিদির মানসিকতা। সেখানে দেশের ক্ষতি একটা ধর্তব্যের বিষয়ই নয়।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রসন্ন আবার বললে, আমার তো মনে হয় এতদিনে দিদি আমাদের কথাও টের পেয়েছে। দাদার হাতে মিলিটারীর গোপন কাগজপত্র তুলে দিয়ে আমি যে টাকা রোজগার করছি এখবরও বোধহয় সে জেনেছে।

—জেনেছে তো হয়েছে কি? উষ্মা প্রকাশ পায় শেফালীর কণ্ঠে।

—মুখে না বললেও এজন্যে মনে মনে বোধহয় সে আমাকে ঘৃণা করে।

স্বামীর কথার জবাব দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শেফালীর। বললে, ইস, ঘৃণা করলেই হলো? মুখ ফুটে যদি কোনদিন বলে তো সেদিন দিদিকে শুনিয়ে দেব যে তোর পাকিস্তানী মুসলমান বর গুপ্তচরের কাজ করে যতটা অপরাধী আমার বর দু-চারখানা কাগজ তার হাতে তুলে দিয়ে তার চাইতে বেশি অপরাধ করে নি।

শঙ্কিত কণ্ঠে বলে ওঠে প্রসন্ন, সর্বনাশ. এ নিয়ে তুমি তোমার দিদির সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও নাকি?

জবাব দেয় শেফালী, দরকার হলে করবো বৈকি। তোমাকে দোষারোপ করলে আমিও ছেড়ে কথা কইবো না।

স্ত্রীর কথায় খুশি হয়ে প্রসন্ন শেফালীকে টেনে নেয় নিজের কাছে।

শেফালী বাস্তবিকই মূর্খ। সে জানে না, গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে একজন বিদেশী নাগরিক যতটা দোষী, তাকে সাহায্য করার দায়ে স্বদেশের একটি লোক তার চাইতে অনেক বেশি অপরাধী। বিদেশী নাগরিক গুপ্তচরবৃত্তি করে তার নিজের দেশের মঙ্গলের জন্যে, কিন্তু স্বদেশের মানুষটির কাজ তার নিজের দেশের বিরুদ্ধে। প্রথম লোকটির অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হলেও দ্বিতীয়ের অপরাধের কোন ক্ষমা নেই।

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাস। ছোট দিলীপ ওরফে নূর ইসলাম শিয়ালদহ-পাঠানকোট ট্রেনের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে আছে চিন্তিত মুখে। সে পাঠানকোট চলেছে যশোহরের নির্দেশে। ভয়ানক এক দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে চলেছে। এই প্রথম

তার পশ্চিম বাংলার বাইরে যাওয়া। তারওপর যে কাজে সে চলেছে তাতে এতটুকু ভুলচুক হলেই ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা। খবর এসেছে যে ইদানীং ভারতীয় কাউন্টার এস্‌পিওনেজ নাকি খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পাঞ্জাবের পাঠানকোট। সেই পাটানকোট থেকে অতি সংগোপনে নিয়ে আসতে হবে কিছু গোপনীয় কাগজপত্র। নূর ইসলাম ইংরেজী কিম্বা পাঞ্জাবী ভাষা জানে না। তবে মোটামুটি উর্দু বলতে পারে। সেই ভরসাতেই 'মামা' তাকে দিয়েছে এই দায়িত্ব। তবে ভরসা আরও একটা আছে—যার কাছ থেকে সেই 'মাল' জোগাড় করতে হবে সেই নগেন সরকার বাঙ্গালী। পাঠানকোট বদলী হবার আগে সে শিলিগুড়িতেই ছিল যদিও নূর তাকে দেখেনি কখনও।

নগেনের কাছে আগেই খবর চলে গিয়েছিল যে ব্যারাকপুর থেকে নূর ইসলাম ওরফে দিলীপ দে যাচ্ছে তার কাছে। কখন কোথায় তাদের সাক্ষাৎ হবে সে সম্পর্কেও মোটামুটি খবর পৌঁছে ছিল নগেনের কাছে। কিন্তু মুশকিল হলো তারা পরস্পরের কাছে একান্তই অপরিচিত।

পাঠানকোট স্টেশনে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নূর সোজা চলে এলো পাঞ্জাব হোটেলে। মাঝারি ধরনের হোটেল। সামনেই রিসেপশন রুম।

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে মালপত্র নিয়ে নূর রিসেপশন কাউণ্টারে এসে দাঁড়াতেই রিসেপশনিস্ট পাঞ্জাবী ছোকরা স্পষ্ট ইংরেজী উচ্চারণে বললে সরি, নো ভেকান্সি।

ইংরেজী না জানলেও ছোকরাটির কথার অর্থ মোটামুটি বুঝতে পারে নূর। বিপদের আশঙ্কায় মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে তার। সর্বনাশ, গোটা প্ল্যানটাই যে তাহলে মাটি হয়ে যাবে।

ভাঙ্গা উর্দুতে নূর ছোকরাটিকে বললে, দেখুন ভাই, আমি কলকাতা থেকে এসেছি। এখানকার কিছু আমি জানি না। কথা আছে এখানকার একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই হোটেলে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি যদি অন্য কোন হোটেলে যাই তাহলে হয়তো সে ফিরে যাবে। আমি বিপদে পড়বো। দয়া করে কোনরকমে যদি একটু থাকার ব্যবস্থা করতে পারেন —।

নূরের অনুনয়ের ভঙ্গিতে একটু ম্লান হাসে সেই পাঞ্জাবী ছেলেটি। তারপর উর্দুতে জবাব দেয়, দেখুন, জায়গা যদি থাকতো তাহলে আপনাকে ফিরিয়ে দেব কেন? বাস্তবিকই জায়গা নেই।

চিন্তিত কণ্ঠে নূর বললে, তাহলে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে এখন কী করি বলুন তো?

একটু সময় কি যেন ভাবে সেই রিসেপশনিস্ট ছেলেটি। তারপর জিজ্ঞেস করে, আপনার সেই বাঙ্গালী পরিচিত ভদ্রলোকটি কখন এখানে আসবে, জানেন?

—আজই তো আসার কথা। যদি কোন কারণে আজ না আসতে পারে তাহলে কাল সকালে অবশ্যই আসবে।

আবার একটু সময় চিন্তা করে ছেলেটি। অবশেষে বলে ওঠে, ঠিক আছে আজ একটা রাতের জন্যে আপনাকে একটা ঘর দিচ্ছি। কাল বেলা দশটায় আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। যিনি ঘরটা বুক করেছেন তিনি কাল দশটায় আসবেন।

অগত্যা তাতেই রাজি হতে হলো নূরকে।

নিজের ঘরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে একটু সুস্থ হয়ে নিল নূর। ইচ্ছে ছিল বিছানায় একটু গড়িয়ে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করে নেয়। কিন্তু তেমন সাহস তার হলো না। নগেন সরকার যদি তাকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে যায় তাহলে মুশকিলে পড়তে হবে তাকে।

নিজের ঘরে বিশ্রামের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে রিসেপশন কাউণ্টারে এসে বসে নূর। মনে আশা, এই পাঞ্জাবীর রাজ্যে বাঙ্গালী নগেন সরকারকে দেখলে সে অবশ্যই চিনতে পারবে। তারপর সেই বিশেষ সাংকেতিক কথা উচ্চারণ করে সে তার পরিচয় যাচাই করে নেবে।

কাউণ্টার এস্পিওনেজ অর্থাৎ চোরের ওপর বাটপাড়ির বিরুদ্ধে এই সাংকেতিক কথার ব্যবহার যা নাকি সত্যিকারের নগেন সরকার ছাড়া আর কেউ জানে না। কোন ছদ্মবেশী নগেন সরকার এসে ভাঁওতা দিয়ে নূরকে বিপদে ফেলতে পারবে না।

রিসেপশন কাউণ্টারে লোকজন আসা যাওয়া করছে। দেওয়ালের একপাশে সোফায় বসে তাদের ওপর নজর রাখছে নূর। হঠাৎ দরজার কাছে একটি লোককে দেখে চমকে ওঠে নূর। স্পষ্ট বাঙ্গালী চেহারা।

নূর তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে লোকটির দিকে। লোকটি রিসেপশন কউন্টারে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজতে থাকে।

আনন্দে মনটা নেচে ওঠে নূরের। এতক্ষণে সে দেখা পেয়েছে নগেন সরকারের। তড়াক করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নূর। তারপর দ্রুত পায়ে লোকটির সামনে গিয়ে মৃদু হেসে বলে ওঠে, হ্যাল্লো মিস্টার গুপ্ত।

নূরের কথায় লোকটির চোখে মুখে ফুটে ওঠে বিস্ময়। নূরের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে সে কেবল তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

—হ্যাল্লো মিস্টার গুপ্ত। লোকটির প্রায় কানের কাছে মুখ এনে নূর আবার সেই সাংকেতিক কথা উচ্চারণ করে। আসলে নগেন সরকারকে 'গুপ্ত' বলে সম্বোধন করাই হচ্ছে সেই বিশেষ সঙ্কেত।

এতক্ষণে লোকটির মুখে ফুটে ওঠে বিরক্তির চিহ্ন। ভুরু কুঁচকে সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় নূরের দিকে। তারপর ঝাঁঝালো কণ্ঠে উর্দুতে বলে ওঠে, কে আপনি? আমি গুপ্ত নই। আমি হচ্ছি মিস্টার পুরী।

লোকটির কথায় একটু ঘাবড়ে যায় নূর। এক মুহূর্ত চিন্তা করে সে আবার জিজ্ঞেস করে, আপনি বাঙ্গালী নন?

এবার হো হো করে হেসে ওঠে লোকটি। হাসতে হাসতে বললে, আমাকে বুঝি বাঙ্গালীর মত লাগছে? তা অবশ্যি লাগতে পারে, আমার বাবা একবার দিনকয়েকের জন্যে কলকাতায় গিয়েছিলেন।

লোকটি ঠাট্টা করছে কিনা বুঝতে না পেরে নূর আর কথা না বাড়িয়ে চলে আসে নিজের জায়গায়। লোকটি সোজা চলে যায় কাউন্টারের কাছে। কি যেন জিজ্ঞেস করে রিসেপশনিস্টকে। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে কৌতুক চোখে নূরের দিকে একবার তাকিয়ে যেতে ভোলে না।

একজন অবাঙ্গালীকে বাঙ্গালী ভেবে নাকাল হয়ে একটু সাবধান হয় নূর। না, এভাবে আর সে নাকাল হবে না।

একটু পরেই একজন লোক এসে দাঁড়ায় নূরের সামনে। নূর প্রথমটায় নিজের কৌতূহল দমন করে তাকায় তার দিকে। লোকটি অবাঙ্গালী। তারপর নূর উঠে দাঁড়িয়ে উর্দুতে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি কিছু বলবেন?

আশ্চর্য ব্যাপার। লোকটির মুখে স্পষ্ট বাংলা। সে বললে, আমি একজন লোককে খুঁজতে এসেছি। লোকটি আজই এসেছে কলকাতা থেকে।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে নূর। তারপর বলে ওঠে, হ্যাল্লো মিস্টার গুপ্ত।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় লোকটি, হ্যাল্লো মিস্টার দিলীপ।

সাংকেতিক প্রশ্নের সঙ্গে মিলে গেছে সাংকেতিক উত্তর। আর কোন সন্দেহ নেই। হাঁপ ছাড়ে নূর। খুশির হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। কিছু বলতে যায় সেই লোকটিকে। কিন্তু তার আগেই ঠোঁটে আঙুল রেখে লোকটি জানিয়ে দেয় যে এখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলা বিপজ্জনক।

পাঠানকোটে মাত্র একটা দিন থাকতে হলো নূরকে। নগেন সরকারের কাছ থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ সেই কাগজপত্র জোগাড় হলো। বিনিময়ে মোটা টাকা হাতে পেয়ে নগেন সরকার তো মহাখুশি। নূর তেমন লেখাপড়া জানে না। তাই তার ফেরার ব্যাপারে রেলের রিজার্ভেশন স্লিপ নগেনকেই লিখে দিতে হলো। আর পরবর্তী কালে রিজার্ভেশন স্লিপে নগেনের সেই হাতের লেখাই হয়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে একটা মস্ত প্রমাণ।

॥ সতের ॥

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম। ব্রিটিশের তৈরি এই কেল্লায় একদিন বিনা অনুমতিতে একটা মাছির পর্যন্ত ঢোকার সাধ্য ছিল না। চারিদিকে সতর্ক প্রহরী। পদে পদে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি। আজও সেই প্রহরী রয়েছে, আজও রয়েছে সেই তল্লাশির নিয়মকানুন। কিন্তু সবই যেন কেমন লোক দেখানো ব্যাপার। নইলে, মিলিটারী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র কেমন করে বাইরে চলে এসে পাচার

হয় পাকিস্তানে? কেন সেই গৃহশত্রু বিভীষণদের ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হয় না?

মনোরঞ্জন সরকার শিলিগুড়ি থাকতে পাকিস্তানী গুপ্তচর আব্দুল করিম ওরফে স্বপন চৌধুরীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। স্বপনের গুপ্তচরবৃত্তির প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল মনোরঞ্জন। শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক বদলী হবার পরে সেই ঘনিষ্ঠতার বাঁধন স্বাভাবিক কারণেই খানিকটা আলগা হয়ে উঠেছিল। অবশেষে গ্যাংটক থেকে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে বদলী হতেই স্বপনের সঙ্গে মনোরঞ্জনের সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়ে গেল। এত দূরে বসে মনোরঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হলো না স্বপনের।

কিন্তু তাই বলে হা-হুতাশ করতে হলো না মনোরঞ্জনকে। অচিরেই স্বপনের সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এলো নূর ইসলাম। সে তখন ব্যারাকপুরের বসিন্দা।

মনোরঞ্জনের কর্মস্থল ফোর্ট উইলিয়াম, আর বাসস্থান শ্যামবাজারের ভাড়াবাড়ি। প্রথমদিন খোঁজ খবর করে ফোর্ট উইলিয়ামে ঢুকে মনোরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে খানিকটা অসুবিধে হয়েছিল নূরের। অবশেষে দেখা হতেই মনোরঞ্জন হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, কোত্থেকে এলেন?

—ব্যারাকপুর থেকে।

—সেখানে কি?

—আজকাল সেখানেই তো থাকি।

—কাজ কারবার?

—ওখানে বসেই করছি।

—আমার এখানে বদলীর খবর পেলেন কোথায়?

—এসব খবর কি চাপা থাকে?

একটু সময় চুপ করে থেকে মনোরঞ্জন আবার জিজ্ঞেস করে, আমার কাছে কি জন্যে এসেছেন?

সহসা জবাব না দিয়ে নূর কেবল একটু হাসে। তারপর বললে, আপনার কাছে কেন এসেছি তা কি আপনি জানেন না?

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে মনোরঞ্জন। তারপর গলা খাটো করে বললে, এ শিলিগুড়ি কিম্বা গ্যাংটক নয়। এ হচ্ছে গিয়ে খোদ ফোর্ট উইলিয়াম। এখানকার খবরাখবরও যেমন দামী,

সেই খাবরাখবর জোগাড় করাও তেমনি শক্ত।

খোশামোদের সুরে নূর বললে, আপনার কাছে তো যে কোন শক্ত জিনিসই জলের মত সহজ হয়ে ওঠে। শিলিগুড়ি থাকতে স্বপনবাবু তো তাই বলতেন।

খোশামোদে মনটা ভরে ওঠে মনোরঞ্জনের। কৃত্রিম গম্ভীর সুরে সে জিজ্ঞেস করে, ফোর্ট উইলিয়ামের কাগজপত্র হলে যে খরচ-খরচা লাগবে তা কি আপনাদের গভর্নমেন্ট দিতে পারবে?

—নিশ্চয়ই পারবে, সঙ্গে সঙ্গে জাবাব দেয় নূর, ভারি খবরের জন্য ভারি পায়সা তো লাগবেই। আমি যশোহরের মেজর সাহেবকে বলে সব ব্যবস্থা করে দেব।

—ঠিক আছে, আপনি একদিন আমার বাসায় আসুন।

—কোথায় আপনার বাসা?

—শ্যামবাজারে। কথাটা বলেই মনোরঞ্জন ঠিকানাটা বলে দেয়।

গরজ বড় বালাই। পরের দিনই মনোরঞ্জনের শ্যামবাজারের বাসায় এসে হাজির হয় নূর। সঙ্গে গাঙ্গুরামের দোকানের এক বাক্স সন্দেশ।

স্ত্রীর মতিগতি সুবিধের নয় বলে মনোরঞ্জন নিজের বাড়িতে বসে নূরের সঙ্গে কথা বলতে সাহস করে না। চা-জলখাবারে নূরকে পরিতৃপ্ত করে তাকে নিয়ে রাস্তায় বেরোবার উদ্যোগ করতেই তার স্ত্রী তাকে আড়ালে ডেকে বললে, ঐ লোকটা শিলিগুড়ি থেকে এই কলকাতা পর্যন্ত তোমার পিছে পিছে ছুটে এসেছে। বল তো ওর মতলবটা কি?

ঢোক গিলে স্ত্রীর কাছে নির্জলা মিথ্যে বলে যায় মনোরঞ্জন। বললে, তুমি তো জানো শিলিগুড়িতে এই ছোট দিলীপ স্বপন ও বড় দিলীপের কাছে কাজ করতো। বেচারার সেখানকার চাকরি গেছে। এখন এই কলকাতাতেই সামান্য ব্যবসা-ট্যাবসা করে। কাজকর্মের কিছু সুবিধের জন্যেই এসেছে আমার কাছে।

স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মহিলা তার কথার সত্যাসত্য বুঝতে চেষ্টে করে। তারপর বললে, তা ঐ ছোট দিলীপকে নিয়ে এখন চললে কোথায়?

—কোথায় আর যাবো? জবাব দেয় মনোরঞ্জন, এই রাস্তায় দাঁড়িয়েই একটু কথা বলে ওকে বিদায় দেব। তোমার যা ঘর-

দোরের অবস্থা তাতে বাইরের কাউকে এনে কি এখানে বসানো চলে ?

স্বামীর কথার ধরনে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে মহিলা। বললে, অতই যদি ইচ্ছে তাহলে একখানা রাজপ্রাসাদের ব্যবস্থা করলেই তো পারো। কে বলেছে এই পায়রার খোপের মধ্যে থাকতে ?

মনোরঞ্জন তার স্ত্রীকে আর বেশি না ঘাঁটিয়ে নূরকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

মোটামুটি বন্দোবস্ত সব ঠিক। ত্'-চার দিনের মধ্যেই মনোরঞ্জন কিছু গোপন কাগজপত্র এনে তুলে দেবে নূরের হাতে। এর বদলে যশোহরের মামা কি পয়সা-কড়ি মঞ্জুর করে তা দেখেই ভবিষ্যতে কাজ কারবার চালানোর ব্যাপারটা মনোরঞ্জন ভেবে দেখবে।

নির্দিষ্ট দিনে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বেরিয়ে আসে মনোরঞ্জন। সঙ্গে মিলিটারীর কিছু গোপন কাগজপত্র।

গঙ্গার পাড়েই দাঁড়িয়েছিল নূর। মনোরঞ্জন বেরিয়ে আসতেই মুখে কিছু না বলে সে কেবল ইঙ্গিতে জানায় যে সব ঠিক আছে কিনা। তেমনি চোখের ইঙ্গিতে তাকে আশ্বাস দেয় মনোরঞ্জন।

তুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে ইডেন গার্ডেনে। সেখানেই মনোরঞ্জন নূরকে হস্তান্তর করে সেই কাগজপত্র।

পরের দিনই সেই কাগজপত্র বিমল রায় ওরফে রফিকুদ্দিন ওরফে খোকনের মারাফত নূর পাঠিয়ে দেয় পূর্ব পাকিস্তানের যশোহর জেলার মেজর সাহেবকে।

দিন কয়েক পরে একদিন নূর এসে কিছু টাকা তুলে দেয় মনোরঞ্জনের হাতে। টাকার অংক দেখে ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে মনোরঞ্জনের। সে নূরকে বললে, আমার ঐ কাজের দাম মাত্র এই সামান্য কয়েকটা টাকা ? আপনাদের দিনাজপুরের মেজর লতিফ হলে এর চাইতে অনেক বেশি পাওয়া যেত।

একটু আমতা আমতা করে নূর বললে, তা অবশ্যি ঠিক। তবে সবাই তো আর মেজর লতিফের মত দিল-দরিয়া স্বভাবের লোক নয়।

—তা আপনি যাই বলুন, এই সামান্য পারিশ্রমিকে এই বিপজ্জনক কাজ আর করতে পারবো না আমি। আপনার যশোহরের মামাকে কথাটা জানিয়ে দেবেন।

একজন তৈরি এজেণ্ট যে এমনিভাবে হাতছাড়া হয়ে যাবে এটা

ঠিক সহ্য করতে পারে না নূর। আবার মনোরঞ্জনের বরাদ্দ টাকার অঙ্ক বাড়াবার পথও সে খুঁজে পায় না। যশোহরের 'মামা' একটু কড়া ধাঁচের লোক। তদ্বির করেও তার কাছে থেকে কিছু সুফল লাভ হবে বলে মনে হয় না নূরের।

নূরকে চুপ করে থাকতে দেখে মনোরঞ্জন নিজে থেকেই আবার জিজ্ঞেস করে, আপনাদের যশোহরের মেজর সাহেব বুঝি একটু কৃপণ প্রকৃতির? হাত দিয়ে বোধহয় তার জল গলে না?

সামান্য মাথা নেড়ে সায় দিয়ে নূর চুপ করে থাকে।

—দেখুন ভাই, বলতে থাকে মনোরঞ্জন, এই সামান্য টাকায় এতবড় ঝুঁকি নিয়ে যশোহরের সঙ্গে কাজ করতে আমি আর রাজি নই। যদি করতেই হয় তো দিনাজপুরের মেজর লতিফের সঙ্গেই করবো, নইলে নয়।

—তা কি করে হয়? বলে ওঠে নূর, আমি যখন যশোহরের মেজরের অধীনে কাজ করছি তখন কাগজপত্র তো তাকেই পাঠাতে হবে।

—আমি সেসব জানি না, বলতে থাকে মনোরঞ্জন, যশোহর হোক কিম্বা দিনাজপুর হোক, কাগজপত্র তো শেষ পর্যন্ত আপনাদের হেড-কোয়ার্টার ঢাকার ব্রিগেডিয়ারের কাছেই যাবে?

—তা যাবে। মাথা নেড়ে সায় দেয় নূর।

—তাহলে আপনি এমন ব্যবস্থা করুন যাতে আমার দেয়া কাগজপত্র মেজর লতিফের হাতে গিয়ে পড়বে। আমি পয়সাকড়ি নেবও তার কাছ থেকেই।

একটু সময় চুপ করে থেকে বলে ওঠে নূর, তা তো বুঝলাম। তবে এই ব্যবস্থা করার মালিক তো আমি নই। ইচ্ছে করলে বোধহয় আপনি নিজে তা করতে পারেন।

—কেমন করে?

আবার একটু ভাবে নূর। তারপর বলতে থাকে, আপনি নিজে একবার চলে যান দিনাজপুর। সেখানে গিয়ে মেজর লতিফের সঙ্গে কথা বলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন। আমার তো মনে হয় আপনি নিজে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলে একটা ব্যবস্থা হবেই।

—আমি যাবো পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুরে?

—হ্যাঁ, তাই যাবেন।

—যদি বিপদে পড়ি ?

—আমরা থাকতে আপনার বিপদ হবে কেন ?

—পাসপোর্ট-ভিসা ?

—দরকার নেই। আপনাকে বর্ডার পার করবার দায়িত্ব আমার।

—আচ্ছা, ভেবে দেখি। সেদিন এটুকু বলেই নূরকে বিদায় দেয় মনোরঞ্জন।

অর্থের প্রতি প্রবল আকর্ষণের কাছে নিজের বিপদ আপদের আশঙ্কা তুচ্ছ হয়ে যায় মনোরঞ্জনের। মনে মনে ঠিক করে, শরীর খারাপের অজুহাতে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে সে পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি দেবে। মেজর লতিফের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে।

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাস। গোটা পূর্ব পাকিস্তান উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। ভোটের উত্তেজনা। পাকিস্তানের সামরিক ডিকটেটরের আদেশে গোটা পাকিস্তানে নির্বাচন। একদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের মুজিবর রহমান, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনাব ভুট্টো। মুজিবের পেছনে গোটা পূর্ব পাকিস্তান, আর ভুট্টোর পেছনে পশ্চিম পাকিস্তানের একটা বিরাট অংশ। পূর্ব পাকিস্তান প্রায় নিশ্চিত যে এই ভোটযুদ্ধে মুজিবর রহমানেরই জয় হবে। কিন্তু তাদের কাছে জয় পরাজয়ের চাইতেও বড় প্রশ্ন এই যে মুজিবর রহমান জয়ী হলে তাঁকে সরকার গড়তে দেয়া হবে কিনা। পাকিস্তানের কলোনী পূর্ব পাকিস্তানের আধিপত্য মেনে নেবে কিনা পশ্চিম পাকিস্তান।

পূর্ব পাকিস্তানের সেই ভোটযুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যেই একদিন মনোরঞ্জন দুর্গানাম স্মরণ করে রওনা হলো দিনাজপুর। ছোট দিলীপ অর্থাৎ নূর ইসলামের ব্যবস্থামত বর্ডার পার হতে কোনই অসুবিধে হলো না তার।

দিনাজপুরের সার্ভে সেকশনের মেজর লতিফ তো মনোরঞ্জনকে কাছে পেয়ে খুব খুশি। মনোরঞ্জন সরকার তো কেবল একজন সাধারণ ভারতীয় নাগরিক নয়, পূর্ব পাকিস্তানের সার্ভে সেকশনের কর্মকুশলতার একটি মস্ত স্তম্ভ এই লোকটি। এর সাহায্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অনেক গোপন খবরই তাদের করায়ত্ব। দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ি, গ্যাংটক ও অবশেষে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে এই লোকটি যেভাবে তাদের সাহায্য করে এসেছে

তাতে তো তাকে প্রায় ভি. আই. পির মর্যাদাই দেয়া উচিত।

মেজর লতিফের সঙ্গে কথা বলে মনোরঞ্জনও খুব খুশি। অবশেষে নিজের পারিশ্রমিকের অঙ্ক বাড়িয়ে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সে নির্বিঘ্নে ফিরে এলো কলকাতায়। ফোর্ট উইলিয়াম জানতেও পারলে না তাদেরই একজন কর্মী তাদের চোখে ধুলো দিয়ে একটা বিদেশী রাষ্ট্রে গিয়ে কি করে এলো।

মনোরঞ্জন কলকাতায় ফিরে এসেই নূরকে খবর পাঠালো ফোর্ট উইলিয়ামে তার সঙ্গে দেখা করতে। ১৯৭০ সালের ২রা জানুয়ারী নূর এলো। ক্যান্টিনে বসে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললে তারা। মনোরঞ্জন নিজের পাকিস্তান ভ্রমণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বললে, সত্যি, মেজর লতিফের মত মানুষ হয় না।

জিজ্ঞেস করে নূর, আপনার কাজের কতদূর কি হলো?

জবাব দেয় মনোরঞ্জন, সব ব্যবস্থা করে এসেছি। আমার দেয়া কাগজপত্র যথারীতি যশোহরেই যাবে। লতিফ সাহেব আপনাদের হেড কোয়ার্টার ঢাকার ব্রিগেডিয়ার সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে পয়সা-কড়ির ব্যাপারটা ফয়সলা করে দেবেন।

ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ফেরার সময় নূর জিজ্ঞেস করে, আজ কি তাহলে শুধু হাতেই ফিরে যাবো? কথাটা বলেই নূর মনোরঞ্জনের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হাসে।

জবাবে মনোরঞ্জনও হেসে বললে, সন্ধ্যের সময় একবার বাসায় আসবেন। দেখা যাক কি করতে পারি।

মনোরঞ্জনের এ ধরনের কথার অর্থ নূরের অজানা নয়। তাই স্বাভাবিক কারণেই মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তার।

রাত প্রায় আটটা। শ্যামবাজার অঞ্চলের একটা রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে নূর ও মনোরঞ্জন। এক সময় মনোরঞ্জন মৃদু কণ্ঠে বললে, এবার থেকে আমাদের আরও সাবধান হতে হবে।

—একথা কেন বলছেন? জিজ্ঞেস করে নূর।

তেমনি মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় মনোরঞ্জন, আমার মনে হচ্ছে আমাদের আফিসে ব্যাপারটা বোধহয় কেউ টের পেয়েছে। আজ একজন অফিসারের কথায় যেন তাই মনে হলো।

চিন্তিত কণ্ঠে নূর বললে, তাহলে তো বাস্তবিকই ভাবনার কথা।

রাস্তার পাশে আলো-আঁধার ঘেরা একটা বন্ধ মোটর গ্যারেজের

সামনে এসে দাঁড়িয়ে মনোরঞ্জন নিজের জামার ভেতরে হাত গলিয়ে বুকের কাছ থেকে টেনে তোলে একগোছা কাগজ।

কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে লোভের আগুন জ্বলে ওঠে নূরের চোখে। অভ্যস্ত হাতে সে তাড়াতাড়ি সেগুলো চালান করে দেয় নিজের জামার মধ্যে। অবশেষে আরও কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলে তারা। সেই মুহূর্তে তাদের আসল নজর কিন্তু রাস্তায় চলাচলকারী লোকজনের দিকে। কেউ তাদের দেখে ফেললো কিনা, কেউ তাদের পিছু নিয়েছে কিনা।

অবশেষে নিঃসন্দেহ হয়ে মনোরঞ্জন ও নূর চলে যায় যে যার পথে। পাকিস্তানী গুপ্তচর নূর ইসলামের সঙ্গে তখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে গোপনীয় কিছু তথ্য ও কয়েকখানা গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারী নক্সার ব্লু প্রিন্ট। এগুলো অচিরেই চলে যাবে পূর্ব পাকিস্তানের যশোহরে। সেখান থেকে সোজা ঢাকায় ব্রিগেডিয়ার সেলিম সাহেবের কাছে। এ জন্যে ক্যুরিয়ার খোকন ওরফে রফিকুদ্দিন তো তৈরী হয়েই রয়েছে।

॥ আঠারো ॥

একনিষ্ঠ কর্মী বলতে যা বোঝায় স্বপন চৌধুরী ওরফে আব্দুল করিম ঠিক তাই। নিজের গুপ্তচরবৃত্তির কাজ ছাড়া অন্য কোন দিকেই তার মন নেই, এমনকি কোন নারীর দিকেও নয়। তাই যদি থাকতো তাহলে সে অনায়াসেই সুন্দরী বাড়িওয়ালীর মোটামুটি সুন্দরী মেয়ে রূপাকে করায়ত্ব করে তাকে অমুভার মত অবস্থায় ফেলতে পারতো। তেমন সুযোগও যে তার আসে নি, তা নয়। রূপাই নানাভাবে ঘটিয়েছিল তেমন সুযোগ। তার চোখের ভাষা না বোঝার মত বোকা স্বপন নয়। কিন্তু সে পথে যায় নি সে। পূর্ব পাকিস্তানে নিজের স্ত্রীর কথা মনে করেই সে এপথে যায় নি। গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে এদেশের সেনাবাহিনীর খাবরাখবর জোগাড়

করাই তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। মনোরঞ্জন হাতছাড়া হলেও পুরানো-দের মধ্যে সেই কে. পি. সিং তো এখনও আছে। তাছাড়া নিজের চেষ্টায় সে ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন নতুন এজেন্টেও তৈরী করে ফেলেছে। তাদের সাহায্যে কাজকর্ম বেশ ভালই চালাচ্ছে আব্দুল করিম।

ফজলুর রহমান ওরফে বড় দিলীপের কাজকর্মও যে খারাপ চলছে তা নয়। ভায়রাভাই প্রসন্নই তার প্রধান ভরসা। তাছাড়া অধীর ও কিছু নতুন এজেন্টও তার আছে।

কাজকর্ম নিয়ে বড় দিলীপের তেমন একটা অশান্তি না থাকলেও সংসার নিয়ে অশান্তির তার সীমা নেই। অনুভাকে সে কিছুতেই স্বাভাবিক করে তুলতে পারে নি। চেষ্টা করেও সে বিফল হয়েছে। তার কেবল একটিই কথা—তুমি মুসলমান, আমি হিন্দু। তোমার ছেলেকে যখন পেটে ধরেছি তখন সেও নিশ্চয়ই মুসলমান হবে। এতেও আমার দুঃখ নেই, কিন্তু তোমাকে এই গুপ্তচরবৃত্তির কাজ ছেড়ে দিতে হবে। এদেশের সর্বনাশ আর করতে পারবে না তুমি।

—তার মানে, এসব ছেড়ে দিয়ে আমাকে এদেশেই থাকতে হবে?

—ক্ষতি কি তাতে? বলেছিল অনুভা।

—ক্ষতি তোমার না থাকলেও আমার আছে। নিজের দেশ ছেড়ে পরের দেশে পড়ে থাকতে কার ভালো লাগে? তার চাইতে তুমিই চলো না আমাদের ওখানে।

—কোথায়? পূর্ব পাকিস্তানে?

—কেন, সেখানে কি হিন্দু নেই?

—থাকবে না কেন? তবে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমাকে তুমি কোনদিনই সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না। এদেশ ছেড়ে আমি একপাও যাবো না কোথাও।

একটু ভেবে বড় দিলীপ আবার বললে, বেশ, তুমি যদি না যেতে চাও তো যাবে না। তোমাকে তো আর জোর করে নিয়ে যেতে পারবো না। তবে আমার ছেলেকে আমি নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো।

বড় দিলীপের কথায় বাঘিনীর মত চোখ দুটো জ্বলে ওঠে অনুভার। কি একটা কঠিন কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয় সে। দেখতে দেখতে তার জ্বলন্ত চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। পরক্ষণেই ছেলেকে বুকে চেপে চোখের জল সামলাতে সামলাতে

সে উঠে যায় সেখান থেকে। স্ত্রীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে কেবল একটু বাঁকা হাসি হাসে বড় দিলীপ। সেদিন থেকেই একটা ভয় পেয়ে বসে অনুভাকে। ছেলের ভয়। বড় দিলীপ যদি তার কাছ থেকে জোর করে কড়ে নিয়ে যায় তার সন্তানকে? কথাটা ভাবতেই মনটা হাহাকার করে ওঠে অনুভার। সমাজের আইন তাই বলে। ছেলে বাপের, মায়ের নয়। কোন জোর নেই অনুভার।

সত্যিই কি বড় দিলীপ একদিন তার সন্তানকে নিয়ে পাকিস্তান চলে যাবে? অসম্ভব নয়। অনুভা শুনেছে সেখানে নাকি তার একটা বিবি আছে, আর আছে দুটো মেয়ে। হয়তো সেই মেয়ে-ছেলেটার আর কোন ছেলে মেয়েই হবে না। তাই হয়তো অনুভার ছেলের ওপর বড় দিলীপের লোভ। সুযোগমত সে হয়তো একদিন ছেলেকে নিয়ে পাকিস্তান চলে যাবে। অনুভার ছেলেকে হিন্দুস্থান থেকে নিয়ে আসা উপহার হিসেবে দান করবে তার সেই মুসলমান বিবিকে। সেখানে ছেলেমেয়ে নিয়ে সেই বিবির সঙ্গে ঘর সংসার করবে বড় দিলীপ। আর, এখানে বসে চোখের জলে বুক ভাসাবে পুত্রহারা অনুভা। সেদিন থেকেই নিজের সন্তানকে বড় দিলীপের চোখের আড়ালে রাখতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে অনুভা। বাঘিনী যেমন লোভী বাঘের কাছ থেকে আপন সন্তানকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে, এ যেন অনেকটা তাই।

এতদিনে তৎপর হয়ে উঠলো ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী। পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্র সম্পর্কে সজাগ থেকেও তারা এতদিন তেমন কিছু করতে পারেনি। চারিদিকে জাল পেতেছিল তারা, কিন্তু জাল পাতলেই যেমন সব সময় মাছ ধরা পড়ে না, তেমনি সেই গুপ্তচর চক্রের সঠিক হদিশও তারা করতে পারে নি এতদিন। অবশেষে—

১৯৭০ সালের ২২শে জানুয়ারীর এক শীতের রাত। ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত অঞ্চলে সেই শীতের কামড় উপেক্ষা করে আঁকা-বাঁকা জংলী পথে টহল দিয়ে চলেছে পুলিশ বাহিনীর একটি দল। ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারিদিক। জোরালো টর্চের আলোও কুয়াশার পর্দা ভেদ করে বেশিদূর যেতে পারে না। পায়ে জাঙ্গল বুট, গায়ে ওভারকোট ও কাঁধে রাইফেল নিয়ে টহলদার বাহিনী বেড়ালের মত নিঃশব্দে হেঁটে চলছিল। হঠাৎ তাদের মনে হলো একটু দূরে

যেন দুজন লোক নীচু হয়ে হেঁটে চলেছে পাকিস্তান সীমান্তের দিকে

এত রাতে কারা চলেছে ঐ দিকে? কি প্রয়োজন তাদের? এই এলাকায় তো রাতে সাধারণের চলাফেরা নিষিদ্ধ। তাহলে এরা কারা?

—হল্ট্। চিৎকার করে ওঠে বাহিনীর অধিনায়ক।

কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি সেই শীতের ভারি বাতাসে মিলিয়ে যেতে না যেতেই ভয়চকিত হরিণের মত সেই লোক দুটো কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে থতমত খেয়ে। পরক্ষণেই বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে গিয়ে পাশের ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

—পাকড়ো—পাকড়ো। শিক্ষিত টহলদার বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেলে সেই ঝোপ। জ্বলে ওঠে একসঙ্গে অনেকগুলো টর্চের জোরালো আলো। কাঁধের রাইফেল চলে আসে হাতে। রাইফেলের মাথায় চমকে ওঠে ধারালো বেয়নেট। এতক্ষণে শীতের শুকনো ঝরাপাতায় জেগে ওঠে তাদের পায়ের শব্দ। টহলদার বাহিনীর দলপতির গম্ভীর কণ্ঠস্বর আবার জেগে ওঠে, গোলি চালায়গা, বাহার আও!

না, কেউ এলো না। এবার শুরু হলো খোঁজার পালা। তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলো তারা সেই লোক দুটোকে। অবশেষে দলপতি নিজের রাইফেলে আকাশের দিকে একটা ফাঁকা আওয়াজ করতেই অসময়ে ঘুম ভাঙা একদল পাখী পাখা ঝটপটিয়ে গাছ থেকে উড়ে পালালো। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝোপের মধ্যে জেগে ওঠে একটা কণ্ঠস্বর, মারবেন না—মারবেন না। আল্লার কসম, আমি পালাবো না।

একটাকে তো পাওয়া গেল, কিন্তু আর একটা? না, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না অন্য লোকটিকে। অবশেষে ধরাপড়া লোকটাকে নিয়ে আসা হলো পুলিশের ঘাটিতে।

কথাবার্তায় লোকটিকে তেমন শিক্ষিত বলে মনে না হলেও লোকটির পোশাক আশাক কিন্তু ভালই। পরনে গরম কাপড়ের প্যাণ্ট, গায়ে মোটা উলের সোয়েটার, পায়ে চপ্পল।

—কি নাম তোর?

লোকটি কোন জবাব না দিয়ে কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে।

ধমকে ওঠে প্রশ্ন কর্তা, কিরে, বোবা হয়ে গেলি নাকি? জবাব

না দিলে কিন্তু মেরেই ফেলবো। বল এবার, আমাদের দেখে পালাচ্ছিলি কেন?

কাজ হয় ধমকে। মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় লোকটি, ভয়ে।

—কোন পারে থাকিস?

—আজ্ঞে, এপারে।

—কোথায়?

—হালিসহর।

—হালিসহর থাকিস তো এখানে এসেছিলি কেন?

—আজ্ঞে—। জবাব দিতে গিয়ে থেমে যায় লোকটি।

—বল, কেন এসেছিস এখানে।

—আজ্ঞে, ওপারে যাবো বলে।

—তুই পাকিস্তানের লোক?

—আজ্ঞে না।

—তাহলে ওপারে যাচ্ছিলি কেন?

—আমার বাবা-মা ওপারে থাকে।

—কি নাম তোর?

একটু ইতঃস্তত করে লোকটি জবাব দেয়, বিমল রায়।

—এইভাবেই বুঝি এপার-ওপার যাতায়াত করিস?

—আজ্ঞে না। বাবার অসুখ, তাই খবর পেয়েই যাচ্ছিলাম। পাসপোর্ট-ভিসা করাবার সময় ছিল না।

প্রশ্নকর্তা একটু সময় থেমে আবার জিজ্ঞেস করে, তোর সঙ্গে যে আর একটা লোক ছিল সে কে?

—বর্ডার দালাল।

—কি নাম তার?

—জানি না। আমাকে বর্ডার পার করে দেবে বলেছিল।

—কত টাকা নিয়েছিল?

—পঞ্চাশ টাকা।

মাঝে মাঝে বর্ডার পুলিশের হাতে অনেকেই এমনি ধরা পড়ে। কাউকে আদালতে চালান দেয়া হয় কেউ বা ছাড়াও পায় মানবতার খাতিরে।

বিমলও হয়তো ছাড়া পেত, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য রাজ্যের গোয়েন্দা বাহিনী পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্র সম্পর্কে সীমান্ত ঘাঁটি-

গুলোকে সতর্ক করে দিয়েছে। কাজেই সে আর ছাড়া পেল না।

বিমলের দেহ তল্লাসী করতে যেতেই মরা মানুষের মুখের মত সাদা হয়ে উঠল তার মুখ। সামান্য কিছু সাধারণ কাগজপত্র ও কিছু পাকিস্তানী টাকা ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না তার পকেটে। কিন্তু তার আণ্ডার প্যান্টের গোপন পকেট থেকে যা বেরিয়ে এলো তা দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলো পুলিশ বাহিনী। এতদিনে বোধহয় খোঁজ পাওয়া গেল সেই পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্রের। পাওয়া গেল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে কতগুলো গোপন কাগজপত্র ও কিছু মিলিটারী নক্সার ব্লু-প্রিন্ট।

এবার ডাক পড়লো বাঘা গোয়েন্দাদের। চললো জেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অবশেষে পাওয়া গেল বিমল রায়ের পরিচয়। পাকিস্তানী বিমলের আসল নাম রফিকুদ্দিন। স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে সে পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্রের ক্যুরিয়ার অর্থাৎ দূত। বর্ডার পার হয়ে গোপন কাগজপত্র পাকিস্তানে পৌঁছে দেয়াই তার একমাত্র কাজ।

প্রথমে চুনোপুঁটি, পরে রাঘব বোয়াল। রফিকুদ্দিনের দেয়া খবরের ওপর ভিত্তি করেই গোয়েন্দা বাহিনী ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে সক্রিয় হয়ে উঠলো তাদের চরেরা। ধরতে হবে গুপ্তচর চক্রের চাঁইদের। জানতে হবে তাদের ভারতীয় সাকরেদদের নাম-ধাম।

পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষের জন্মজয়ন্তী। সেদিন সহর কলকাতার মত শিল্প সহর ব্যারাকপুরেও বেরিয়েছে এলাকার যুবকদের প্রভাত-ফেরী। আজাদ হিন্দ বাহিনীর মার্চ-সঙ্গীত “কদম কদম বড়ায়ে যা, খুশিসে গীত গায়ে যা—” গানে সেদিন শীতের ঘুম ভাঙলো ব্যারাকপুরের বাসিন্দাদেরও। আর ঠিক সেই কাক ভোরেই ব্যারাকপুরের যে বাড়িটির দরজার কড়া নড়ে উঠলো তার বাসিন্দা ছোট দিলীপ ওরফে দিলীপ দে ওরফে নূর ইসলাম।

দরজা খুলে বাইরে এসেই নূরের চক্ষু স্থির। মাথায় মুখে চাদর জড়িয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বর্ডার দালাল সৈয়দ আলী মোল্লা।

—তুমি এত সকালে? কি ব্যাপার?

—খুব খারাপ খবর, ফিস ফিস করে জবাব দেয় সৈয়দ, কাল রাতে ঘোজাডাঙ্গায় পুলিশের হাতে রফিক ধরা পড়েছে।

—সর্বনাশ, খোকন ধরা পড়েছে? স্খলিত কণ্ঠস্বর নূরের।

—হ্যাঁ, আমি কোনরকমে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

সহসা আর কোন কথা বলতে পারে না নূর। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে তার চোখে-মুখে। অবশেষে বিড় বিড় করে অনেকটা আপন মনেই বললে, খোকনের সঙ্গের কাগজপত্রও বোধহয় পুলিশের হাতে পড়েছে।

সৈয়দ আলী কোন জবাব না দিয়ে কেবল চুপ করে থাকে।

নূর আবার বলতে থাকে, আজই যশোরে মেজর সাহেবকে খবরটা পাঠাতে হবে। কাকে দিয়েই বা পাঠাই। তা, তুমি একবার যেতে পারবে ওপারে?

সৈয়দ আলীকে ইতঃস্তত করতে দেখে নূর তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, থাক, তোমায় যেতে হবে না। আমি নিজেই যাবো।

নূর থামতেই সৈয়দ আলী বললে, দু একদিন পরে গেলে হতো না? বর্ডারে এখন পুলিশের কড়া নজর—।

—না—না, বলতে থাকে নূর, ঐ ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে যাবো না। পানিতোড়—সাকরা বর্ডার দিয়ে পার হবো।

সৈয়দ আলীকে বিদায় দিয়ে নূর এসে ঘরে ঢুকতেই দরজার পাশে দাঁড়ানো নূরের স্ত্রী অনিতা বলে ওঠে, আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে না। একজন যখন ধরা পড়েছে তখন দলের বাকিদের ধরতে পুলিশ নিশ্চয়ই চারিদিকে ওৎ পেতে থাকবে। তুমি বরঞ্চ এখন কিছুদিন কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকো। কি জানি, তোমাদের খোকন হয়তো পুলিশের কাছে তোমার নাম বলে দিয়েছে।

একটু ম্লান হেসে নূর বললে, না, সে ভয় নেই। মরে গেলেও খোকন আমার নাম বলবে না। তবে, সাবধানের মার নেই। কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতেই হবে আমাকে। তবে আজ একবার যশোর যেতেই হবে! মেজর সাহেবকে জানাতে হবে ব্যাপারটা।

দুপুর নাগাদ ব্যারাকপুর থেকে নিজের আস্তানায় ফিরে এলো সৈয়দ আলী। মন খারাপ। খোকন ধরা পড়েছে। বরাত জোরে

সে নিজে পালিয়ে আসতে পেরেছে। চারিদিকে এবার শুরু হবে কড়াকড়ি? এই পরিস্থিতিতে বর্ডার পারাপার করার ব্যবসা আর চালাতে পারবে কিনা সেটাই প্রশ্ন।

ক্লান্ত সৈয়দ আলী নিজের ঘরে ঢুকতে যাবে হঠাৎ একটি সাদাসিধে গোবেচারা ধরনের মানুষ সামনে এসে দাঁড়ায়।

ভ্রূ-কুঞ্চিত সৈয়দ আলী জিজ্ঞেস করে, কি চাই?

—আপনিই সৈয়দ আলী?

—কেন, কি দরকার? সতর্ক সৈয়দ আলী তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় লোকটির দিকে।

গোবেচারা লোকটি গ্রাম্য ভঙ্গিতে জবাব দেয়, পাশপোর্ট ভিসা নেই। কিন্তু—।

লোকটি কথা শেষ করার আগেই বলে ওঠে সৈয়দ আলী, কিন্তু বর্ডার পার হতে চান, তাই তো?

লোকটি মুখে কোন জবাব না দিয়ে কেবল বোকার মত হাসে। একটু সময় চিন্তা করে সৈয়দ আলী। তারপর কিছু বলার জন্যে মুখ তুলতেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে সেই গোবেচারা লোকটির ভাব ভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ভড়কে গিয়ে সৈয়দ আলী দু'পা পিছিয়ে আসতেই সেই লোকটি তার একটা হাত চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'জন লোক হঠাৎ হাজির হয়ে ঘিরে ধরে তাকে।

—একি—একি, আপনারা—?

কথাটা আর শেষ করতে পারে না সৈয়দ আলী। তার আগেই দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে সেই প্রথম লোকটি, এবার চলো মিঞাসাহেব।

—কোথায়? বোকার মত হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে সৈয়দ আলী।

জবাব দেয় একজন, শ্বশুরবাড়ি।

এক থেকে দুই। রফিকুদ্দিন ওরফে খোকনের সাহায্যে ধরা পড়লো বর্ডার দালাল সৈয়দ আলী মোল্লা। তারপর দুই থেকে তিন। এবার নূর ইসলামের পালা।

জেরায় জেরার বিভ্রান্ত সৈয়দ আলীর মুখ থেকে নূরের নামটা বেরিয়ে পড়তেই আবার শুরু হয় জেরা।

—কোথায় থাকে এই নূর ইসলাম?

—ব্যারাকপুর।

—ব্যারাকপুরের কোথায় ?

—নাম ঠিক জানি না।

—বাড়িটা চেন ? দেখিয়ে দিতে পারবে ?

—হ্যাঁ, পারবো। তবে তাকে তো বাড়ি পাবেন না

—কোথায় সে ?

—যশোর।

—কবে গেছে ?

—আজই সকালের দিকে।

—কোন পথে গেছে ?

সৈয়দ আলীকে একটু ইতঃস্তত করতে দেখে প্রশ্নকর্তা গম্ভীর কণ্ঠে সাবধান করে দেয়, মিথ্যে বললে কিন্তু ঘোরতর বিপদে পড়বে।

—না স্যার, জবাব দেয় সৈয়দ আলী, মিথ্যে বলবো না। বোধহয় পানিতোড়-সাকরা বর্ডার দিয়েই গেছে।

—ঐ পথেই কি সে সাধারণতঃ যাতায়াত করে ?

—ঘোজাডাঙ্গা দিয়েও যায়।

—স্মাগলারের ছদ্মবেশে বোধহয় ?

মাথা নেড়ে সায় দেয় সৈয়দ আলী।

—কি নিয়ে যাতায়াত করে ? চামড়ার স্যুটকেশ, নাকি এ্যাটাচি কেস ?

—এ্যাটাচি কেস, স্যার।

—কি রঙের ?

—হালকা সবুজ রঙের।

গোয়েন্দাদের মনে হয় রফিকুদ্দিনের ধরা পড়ার খবর যদি নূর পায় তাহলে দিনের বেলা বর্ডার পার হতে যে সাহসী হবে না। সেক্ষেত্রে সে সন্ধ্যার অন্ধকারের সুযোগ নেবে। তবে এমনও হতে পারে নূর হয়তো যশোর যায় নি, ব্যারাকপুরেই আছে।

দু'দলে ভাগ হয়ে গেল গোয়েন্দা বাহিনী। একদল চলে গেল ব্যারাকপুর। সঙ্গে সৈয়দ আলী। নূরের বাড়িটা দেখিয়ে দেবে সে। আর, অন্যদলটি চলে গেল পানিতোড়। দেখা যাক, তাকে ঐ এলাকায় পাওয়া যায় কিনা।

পানিতোড়-সাকরা বর্ডার পথে পানিতোড় বাজার। সীমান্ত

এলাকার বাজার। প্রকাশ্যে ভারতীয় মুদ্রায় বেচাকেনা হলেও গোপনে পাকিস্তানী মুদ্রায়ও কাজকারবার চলে এখানে।

নূর ইসলামের দুর্ভাগ্য। গোয়েন্দাদের অনুমান মিথ্যে নয়। দিনের বেলা বর্ডার পার হতে সাহসী হয়নি নূর। তাই বাজারের মধ্যে একটা চা-দোকানে বসে চা খাচ্ছিল সে। সন্ধ্যে হতে তখনও কিছু বাকি। নূরের সঙ্গে তার সেই হালকা-সবুজ রঙের এ্যাটাচি কেস। তার মধ্যে কিছু চিরুনী ও পাকিস্তানী টাকা। এসব সরঞ্জাম পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। ধরা পড়লেই স্মাগলারের অভিনয় ও ডায়লগ—কি করবো স্যার, পেটের দায়ে স্মাগলিংয়ের পথে নেমেছি। এপার থেকে কম দামে ভারতীয় চিরুনী কিনে নিয়ে গিয়ে ওপারে বেশি দামে বিক্রি করি।

পানিতোড় বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় গোয়েন্দা ও তাদের অনুচরেরা। নূর ইসলামের চেহারা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়েছিল তারা সৈয়দ আলীর কাছ থেকে। সেই সঙ্গে তার ছদ্মনামটিও। তাছাড়া সেই এ্যাটাচি কেস তো আছেই।

সময় কাটাবার জন্যে চা ছাড়া আর উপায় নেই। এখানকার বর্ডার দালালের সঙ্গে নূর আগেই যোগাযোগ করে এসেছে। সন্ধ্যের পরেই সে রওনা হবে। এই সময়টুকু তাকে এই দোকানে বসে চা খেয়েই কাটাতে হবে।

এ এলাকার চায়ের কাপ প্লেটের বদলে ছোট কাঁচের গ্লাশের প্রচলনই বেশি। নূর ইসলাম তার তৃতীয়বারের গ্লাশের শেষ চা-টুকু গলায় ঢেলে সবে গ্লাশটা নামিয়ে রেখেছে, হঠাৎ সেখানে দু'জন লোকের আবির্ভাব।

নূর কিছু বোঝার আগেই লোক দু'টি তার দু'পাশে বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে। তারপর একজন নূরের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে ওঠে, আপনি তো দিলীপবাবু—দিলীপ দে?

অপরিচিত ব্যক্তির মুখে নিজের হিন্দু নাম শুনে প্রথমটায় একটু বিভ্রান্ত বোধ করে নূর। পরক্ষণেই সেই বিভ্রান্তিটুকু কাটিয়ে উঠে কোন জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, কেন বলুন তো?

—না, এমনিই। বলুন আপনার নাম দিলীপ দে কিনা? এবার প্রশ্নকর্তার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

মুখে কোন জবাব না দিয়ে 'হ্যাঁ' ও 'না' এর মাঝামাঝি

একটা ভঙ্গিতে কেবল মাথা নাড়ে নূর।

প্রশ্নকর্তা আবার বলে ওঠে, যতদূর জানি, এটা তো আপনার ছদ্মনাম, কি বলেন ?

এ ধরনের প্রশ্নে সত্যিই এবার ঘাবড়ে যায় নূর। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, এসব আপনি কি বলছেন ?

—কি বলছি তা কি এখনও বুঝতে পারছেন না ? দিলীপ দে তো আপনার ছদ্মনাম। আপনার আসল নাম তো নূর ইসলাম।

—কে—কে বলেছে এ—এসব কথা ? ভাষাটা প্রতিবাদের হলেও তার মধ্যে ফুটে ওঠে এক অসহায়তার ভঙ্গি।

চায়ের দোকানে তাদের ঘিরে ততক্ষণে সৃষ্টি হয়েছে একটা ছোটখাটো জটলা। এ ধরনের জটলা বিপদজনক। এর মধ্যে। থাকে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ। ধান্ধাবাজেরাও লুকিয়ে থাকে এর মধ্যে এই জটলাই আবার জট পাকিয়ে সময় সময় জটিল হয়ে ওঠে। তাই হাটে বিশদভাবে হাঁড়ি না ভেঙে প্রশ্নকর্তা নূরকে আবার বলে, শুনুন ইসলাম সাহেব, আমরা পুলিশের লোক। এবার চলুন আমাদের সঙ্গে।

'হায় আল্লা'—কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয় নূর। 'পুলিশ' শব্দটা শুনে কৌতুহলী জনতার ভিড় আরও বেড়ে ওঠে। সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা আর একটি কথাও না বলে নূরকে সঙ্গে নিয়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যায়।

এক থেকে দুই, আবার দুই থেকে তিন। বিমল রায় ওরফে খোকন ওরফে রফিকুদ্দিন—সৈয়দ আলী মোল্লা—দিলীপ দে ওরফে ছোট দিলীপ ওরফে নূর ইসলাম। এমনিভাবেই বাড়তে থাকে পুলিশের শিকারের সংখ্যা। পুলিশ টোপ ফেললো নূরের সামনে—মুক্তির টোপ। সবকিছু অকপটে স্বীকার করলে মুক্তির গ্যারান্টি। অন্যথায়, দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে মুক্তির টোপই মুখে পুরলো নূর ইসলাম। রাজি হলো রাজসাক্ষী হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে। স্পষ্ট কণ্ঠে সে স্বীকার করলে, হ্যাঁ, আমি পাকিস্তানী গুপ্তচর। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর গোপন খবর পাকিস্তানে পাচার করাই ছিল আমার কাজ। একাজে আমাকে যারা সাহায্য করতো

তাদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয়।

সত্যিই তারা ভারতীয়—ভারতীয় বিভীষণের দল। তিন থেকে চার—পাঁচ—ছয় ইত্যাদি। ধরা পড়লো শিলিগুড়ি, গ্যাংটক ও সর্বশেষে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের সৈন্যবিভাগের কর্মী মনোরঞ্জন সরকার, শিলিগুড়ির মারহাটা লাইট রেজিমেন্টের অধীর কুমার ঘোষ, ব্যাংডুবির 'এম-ই-এস'এর কে. পি. সিং, পাঠানকোটের নগেন্দ্র নাথ সরকার ইত্যাদি।

গোয়েন্দা বাহিনীর শিকারের ব্যাগ ক্রমেই স্ফীতোদর হচ্ছে। পুলিশের বেতার সংকেত যাতায়াত করছে পশ্চিমবাংলার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। প্রচণ্ড কর্মচাঞ্চল্য গোয়েন্দা বাহিনীর মধ্যে। শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে যাচ্ছে তারা। গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ছে শিকারের ওপর।

কিন্তু সেই আসল চাঁইরা কোথায়? সেই পাকিস্তানী গুপ্তচর বাহিনীর লেফটেনান্ট বড় দিলীপ ওরফে দিলীপ দে ওরফে ফজলুর রহমান? কোথায় সেই স্বপন চৌধুরী ওরফে আব্দুল করিম?

॥ উনিশ ॥

একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি এসেই প্রসন্ন কথাটা বললে স্ত্রী শেফালীকে। বললে, খবর পেলাম কলকাতায় মনোরঞ্জন নাকি ধরা পড়েছে গোয়েন্দাদের হাতে।

—বলছো কি? সবিস্ময়ে বলে ওঠে শেফালী।

প্রসন্ন বললে, তাই তো শুনলাম। কেবল মনোরঞ্জনই নয়, পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্রের আরও অনেকেই নাকি ধরা পড়েছে। গোয়েন্দারা এখন নাকি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাকিদের খোঁজে।

স্বামীর কথায় মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে শেফালীর। কম্পিত কণ্ঠে সে বললে, তাহলে কি হবে? তুমি যদি ধরা পড়ো?

চিন্তিত সুরে জবাব দেয় প্রসন্ন, খবর যা পেলাম তাতে আমিও যে কোন সময় ধরা পড়তে পারি।

—তাহলে উপায়? স্খলিত কণ্ঠস্বর শেফালীর।

প্রসন্ন বললে, উপায় তো কিছু চোখে পড়ছে না।

চিন্তিত ভঙ্গিতে শেফালী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। অবশেষে একসময় বলে ওঠে, চলো আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।

মৃদু সুরে প্রসন্ন বললে, পালিয়ে যাবো কোথায়? আজ হোক কাল হোক পুলিশ খুঁজে বের করবেই আমাকে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই শেফালী বলে ওঠে, চলো আমরা পাকিস্তানে পালিয়ে যাই। সেখানে গেলে তো এখানকার গোয়েন্দা পুলিশ তোমাকে ছুঁতে পারবে না।

—তা হয়তো পারবে না, বলতে থাকে প্রসন্ন, কিন্তু এমনি ভাবে বিদেশে গিয়ে—।

প্রসন্ন কথাটা আর শেষ করতে পারে না। তার আগেই শেফালী আবার বলে ওঠে, স্বদেশ-বিদেশের কথা ছাড়ো তো। যে করেই হোক পালিয়ে বাঁচতে হবে।

স্বামী প্রসন্নর সঙ্গে পাকিস্তানে গিয়ে বাস করতে অনিচ্ছা ছিল না শেফালীর। স্বামীর উপার্জনের দিকেই তার বরাবরের নজর। নিজের দেশের স্বার্থ বিদেশের কাছে বিকিয়ে দিয়ে প্রচুর উপার্জন করেছে প্রসন্ন। সেই অর্থে পাকিস্তানে গিয়ে বাস করতে একটুও আপত্তি নেই শেফালীর। স্বদেশ-বিদেশ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না সে।

প্রসন্নকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলে ওঠে শেফালী, তোমার মত জামাইবাবু ও সেই স্বপনবাবুরও তো বিপদ। তারাও তো ধরা পড়তে পারে যে কোন সময়।

—পারেই তো, বলে ওঠে প্রসন্ন, বুঝতে পারছি না তারা এখনও খবরটা পেয়েছে কিনা।

শেফালী বললে, তাহলে একবার যাও। খবরটা দিয়ে এসো তাদের। দেখো না, এ ব্যাপারে তারা কি বলে?

—হ্যাঁ, তাই যেতে হবে। কথাটা বলেই প্রসন্ন নিজের গায়ের জামাটা খুলতে থাকে।

—ওকি, জামা খুলছো কেন? এখনই একবার যাও।

—এখন গিয়ে তোমার জামাইবাবুর দেখা পাবো না। পরশু দেখা হয়েছিল। বলেছিল, আজ যেন কোথায় যাবে, ফিরতে অনেক রাত হবে

—তাই তো। চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে শেফালীর কপালে। এমন একটা পরিস্থিতিতে একটি মুহূর্তের দামও এখন অনেক।

প্রসন্ন আবার বললে, এখন গিয়ে তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করে তো কোন ফল হবে না। কাল খুব সকালে উঠেই যাবো।

শেফালী আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে।

মিথ্যে বলে নি প্রসন্ন। কথা ছিল বড় দিলীপের সেদিন ফিরতে অনেক রাত হবে। কিন্তু একজন এজেন্টের কাছে এদেশের গোয়েন্দাবাহিনীর ধরপাকড়ের খবরটা পেয়েই সে ফিরে এলো শিলিগুড়ি। সামনে বিপদ। ব্যবস্থা একটা কিছু করতেই হবে।

সোজা বাড়ি না এসে বড় দিলীপ চলে গেল স্বপনের আস্তানায়। বন্ধ দরজার আড়ালে বড় দিলীপ ও স্বপন পরামর্শ করলে অনেকক্ষণ ধরে। অবশেষে এক সময় বড় দিলীপ সেখান থেকে বেরিয়ে এসে শ্বশুরবাড়ির পথ ধরলে।

শীতের রাত। বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েছে। কেবল অনুভা একা জেগে রয়েছে স্বামীর জন্যে।

খেয়ে উঠে বড় দিলীপ চলে এলো নিজের ঘরে। অনুভা লক্ষ্য করেছিল বড় দিলীপ যেন আজ একটু অতিরিক্ত গম্ভীর।

ছোট্ট ছেলেটি মশারির মধ্যে ঘুমুচ্ছে। অনুভা ঘরে ঢুকে স্বামীর গাম্ভীর্যে ভ্রূক্ষেপ না করে খাটের দিকে এগিয়ে যেতেই বড় দিলীপ মুখ তুলে বললে, শোন, একটা কথা আছে।

অনুভা নিঃশব্দে এসে সামনে দাঁড়ায়। এতক্ষণে অনুভা লক্ষ্য করে বড় দিলীপের গম্ভীর মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া যেন লেগে রয়েছে।

কণ্ঠস্বর নীচু করে বড় দিলীপ বললে, শোন অনু, এদেশের গোয়েন্দার হাতে আমাদের কয়েকজন ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে আমাদের সেই নূর। বেইমান নূর নাকি গোয়েন্দাদের কাছে অনেক কথা বলে দিয়েছে। হয়তো আমাদের কথাও বলেছে। যে কোন মুহূর্তে পুলিশ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমাদের ওপর।

বড় দিলীপ লক্ষ্য করে কথাগুলো শুনতে শুনতে কোনরকম ভাবান্তর হয় কিনা অনুভার। কিন্তু না, অনুভার শান্ত মুখের রেখায় সামান্যতম একটি ভাঁজও চোখে পড়ে না তার।

এবার চাপা উত্তেজনা প্রকাশ পায় বড় দিলীপের কণ্ঠে। বলতে

থাকে সে, শেষ পর্যন্ত ঐ নূর যে বেইমানী করে আমাদের এমন বিপদে ফেলবে তা ধারণাই করতে পারিনি।

এতক্ষণে ধীরে ধীরে মাথা তুলে স্বামীর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে অনুভা, এই খবরে আমি হাসবো না কাঁদবো ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে, যেখানে বেইমান নিয়েই তোমাদের কাজ কারবার, সেখানে তোমাদের ঐ নূর আর এমন কি বেশি বেইমানী করেছে? আমরা প্রত্যেকেই তো এক একটি বেইমান।

—তুমিও বেইমান?

—হ্যাঁ আমিও, দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় অনুভা, তোমাদের সবকিছু জেনেও যে আমি চুপ করে আছি এটাই তো দেশের সঙ্গে আমার বেইমানী।

একটু সময় চুপ করে থেকে বড় দিলীপ আবার বললে, আজ রাতেই এখান থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে। স্বপনের সঙ্গে সেই ব্যবস্থাই করে এসেছি।

অনুভা চুপ করে থাকে। বড় দিলীপ আবার বললে, তোমাদেরও যেতে হবে আমার সঙ্গে।

—বেশ যাবো। শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় অনুভা।

বড় দিলীপ আবার বললে, আর একটু সময়ও নষ্ট করতে চাই না। এই শেষ রাতেই রওনা হবো আমরা। কেউ টের পাবে না।

অনুভার ঠোঁটের কোণে এতক্ষণে সামান্য একটু ম্লান হাসি দেখা যেয়েই মিলিয়ে যায়। তেমনি শান্ত কণ্ঠে সে জবাব দেয়, এভাবে পালিয়ে বেড়ালে কি পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবে, ভেবেছো?

—পুলিশ? এদেশের পুলিশ আমার কি করবে? কোনক্রমে একবার বর্ডারের ওপারে পা দিতে পারলেই—।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই চমকে ওঠে অনুভা। স্খলিত কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে, বর্ডারের ওপারে? কোথায় পালাতে চাইছো তুমি?

—কেন, নিজের দেশে—পাকিস্তানে।

—না—না—না, চিৎকার করে ওঠে অনুভা, আমি যাবো না। এদেশ ছেড়ে একপাও যাবো না আমি।

কৃত্রিম নিরাসক্ত সুরে বড় দিলীপ বললে, যেতে না চাও, যেও

না। তবে আমাকে যেতেই হবে। এদেশের জেলে বসে পচতে আমার ইচ্ছে নেই।

—বেশ তো, তাই যাও।

—হ্যাঁ, তাই যাবো এবং আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই যাবো।

এতকাল পরে এবার সত্যিই বাঘ পড়েছে। অনুভার আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হতে চলেছে। তার বুকের নিধিকে তার কাছ থেকে চিরতরে কেড়ে নিয়ে যেতে চায় তার স্বামী। কিন্তু না, কিছুতেই তা হতে দিতে পারে না অনুভা।

কিন্তু অনুভাই বা কেমন করে ছেলেকে ধরে রাখবে? ছেলের ওপর বাপের অধিকারই তো সর্বজনস্বীকৃত। সেখানে মা তো কেবল প্রতিপালিকা ছাড়া আর কিছু নয়।

সহসা দু চোখের কোল ছাপিয়ে জলের ধারা নেমে আসে অনুভার? চাপা কান্নার সুরে সে বলতে থাকে, ওগো নিও না, ওকে তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিও না। তোমার পায়ে পড়ি। ওকে ছাড়া আমি বাঁচবো না—কিছুতেই বাঁচবো না।

—বেশ তো, তোমার ছেলেকে তো তোমার কাছ ছাড়া করতে চাই না আমি। সে চিরকাল তোমার কোল জুড়েই থাক। তোমাদের দু'জনকেই আমার সঙ্গে পাকিস্তানে গিয়ে থাকতে হবে।

অনুভা আর কোন কথা বলে না। তার বুকের মধ্যে তখন ঝড়ের দাপাদাপি। একদিকে পুত্রস্নেহ, অন্যদিকে ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সমাজের মধ্যে আত্মবিলোপ। এর একটাকে বেছে নিতে হবে এবং এখনই তা নিতে হবে। চিন্তা ভাবনার সময় নেই।

পরের দিন সকালে প্রসন্ন যখন তার শ্বশুরবাড়ি এলো তখন সেখানে হুলুস্থুলু কাণ্ড। শিশু সন্তান সহ বড় দিলীপ ও অনুভা নিখোঁজ। প্রসন্ন কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো শ্বশুরবাড়ি থেকে। আর দ্বিধা নয়, শেফালীকে নিয়ে সেও এবার অনুসরণ করবে বড় দিলীপকে।

সামান্য কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান মাত্র। নূর ইসলামের কাছ থেকে গোয়েন্দা বাহিনী যখন পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্রের লেফটেন্যান্ট বড় দিলীপ ওরফে দিলীপ দে ওরফে ফজলুর রহমান, স্বপন চৌধুরী ওরফে আব্দুল করিম ও প্রসন্নকুমার দাসের খবর পেয়ে তাদের আস্তানায় হানা দিলে তখন তারা চলে গেছে দূরে—অনেক দূরে।

আর কোনদিন হয়তো এদেশে ফিরে আসবে না হতভাগিনী অনুভা। পুত্রস্নেহের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে সে। ঐ ছেলে একদিন বড় হবে। পিতৃপরিচয়েই সেদিন সে হবে পরিচিত। বংশ পরম্পরায় চলবে সেই পরিচয়। তারমধ্যে কোন স্থানই থাকবে না অনুভার। বড়জোড় কেউ কেউ হয়তো বলবে যে তাদের বংশে একদা এসেছিল এক হিন্দু রমণী। কিন্তু তার আত্মবিলোপের কথা কেউ উচ্চারণও করবে না কোনদিন।

আজও হয়তো বেঁচে আছে অনুভা। হয়তো কোন মুসলমানী নামকরণ হয়েছে তার। বর্তমান বাংলাদেশের সহর এলাকার কোন ঘিঞ্জি বাড়ির একচিলতে খোলা বারান্দায় কিম্বা কোন গ্রামের বাঁশঝাড়ের পাশে পুকুর পাড়ে হয়তো আজও অবসর সময় এসে দাঁড়ায় সে। হয়তো মনে পড়ে তার অতীতের কথা। উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের অজান্তেই হয়তো একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুকের পাঁজর ভেদ করে। সেই নিঃশ্বাসের বায়ুতরঙ্গ কিন্তু ছড়িয়ে পড়তে পারে না বেশিদুর, সীমান্তের ওপার পর্যন্ত তো নয়ই।